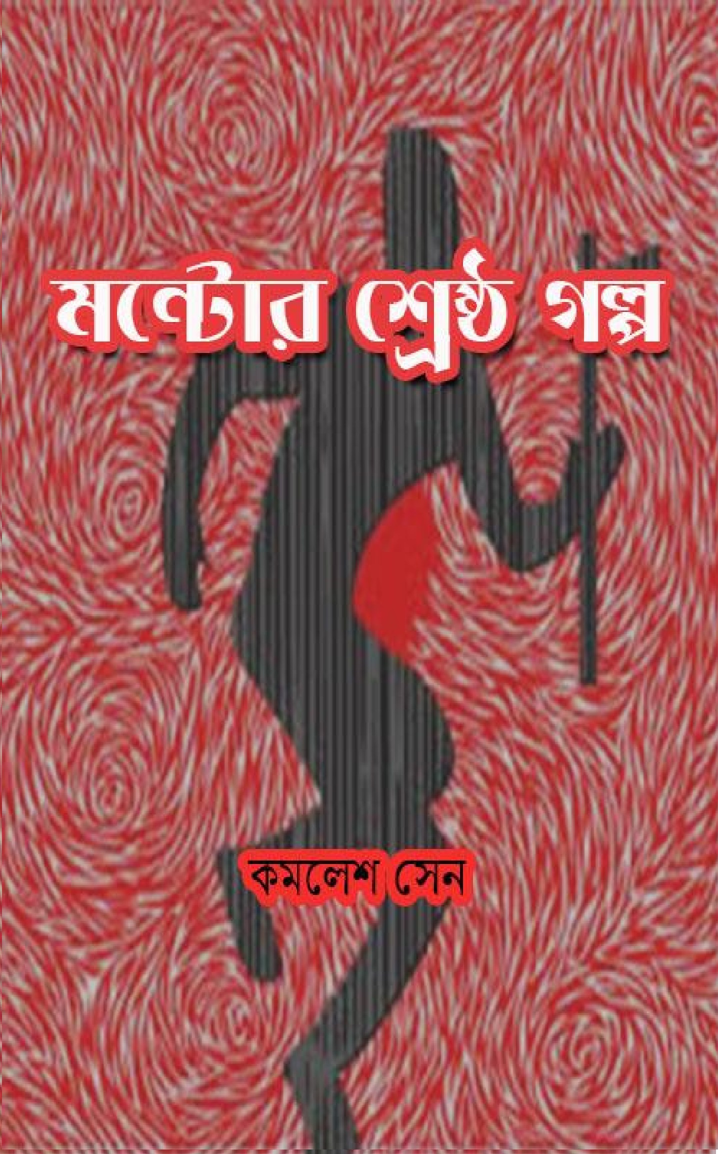
মন্টোর শ্রেষ্ঠ গল্প
কমলেশ সেন

মন্টোর শ্রেষ্ঠ গল্প

কমলেশ সেন

বাংলা সাহিত্যের সমুদ্র হইতে
আরো কিছু মনি-মুক্তো সংগ্রহ করুন

নীচের লিংক হইতে

www.banglabooks.in

প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৩৬৭/এপ্রিল ১৯৬০
প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কল-৯
মুদ্রাকর ঃ দুলাল জানা। নিউ গঙ্গামাতা প্রিণ্টিং। ১৯ডি, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কল-৬
প্রচ্ছদ ঃ পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

উৎসর্গ

নীলকণ্ঠের দোয়েলকে

টোবা টেকসিং	১৯
খোদার কসম	২৭
হেরে চলে গেল	৩৩
লাইসেন্স	৩৯
গুরমুখ সিং-এর উইল	৪৮
কালো শালোয়ার	৫৫
ইদন	৭১
অর্ধেক নারী	৭৭
নয়া কানুন	৮৩
স্বরাজের জন্য	৯৫
উনিশ শ' উনিশের একটি ঘটনা	১২৫
শাহদোলার ইঁদুর	১৩৫
আমি কেন লিখি	১৪১
এক নজরে মণ্টো	১৪৪

উদর্ন্ন সাহিত্যের খোদাতাল্লা মণ্টো

"এখানে সাদাত হাসান মণ্টোকে দফন করা হয়েছে। তার বনুকের গভীরে গল্পের রহস্য এবং মর্মকথা তা এখানে কবরে শায়িত। যেন মাটির নিচে শনুয়ে শনুয়ে ভাবছে, সে বিরাট গল্পকার, না খোদাতাল্লা।"

মণ্টোর ইচ্ছে ছিল, তার কবরের ওপর এই কথাকটি লেখা থাক। এ তার অহংকার নয়, বরং বলা যায়, খোদাতাল্লার থেকে বড় একজন কথা-শিল্পীর আত্মবিশ্বাস। আর যে আত্মবিশ্বাস—সৃষ্টির যে প্রচণ্ড ব্যথা এবং বেদনা সেই ব্যথা এবং বেদনা তার দেহের প্রতিটি রক্তের তন্ত্রীতে নিয়ত প্রবাহিত হতে হতে তাকে সমাজের গহীন অন্ধকারে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

টেনে নিয়ে গিয়েছিল বললে ভনুল হবে, তিনি স্বেচ্ছায়—আবেগে সমাজের সেই মানুষের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, দাঁড়িয়ে সেই পাঁক গায়ে না লেপটেও, সেই পাঁকের এক একটি কীটের মর্ম ব্যথাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

মণ্টোর সাহিত্যিক জীবন শনুরনু হয় 'লা মিজারেবল' এবং গোর্কীর গল্প অনুবাদের মধ্যে দিয়ে। 'লা মিজারেবল' এবং গোর্কীর গল্পের মধ্যে মানুষের জীবনের যে সভ্যতা, যে নিবিড় মমতা এবং যে গভীর বোধ এবং ব্যথা, তা তিনি তাঁর লেখক জীবনের শনুরনুতেই অনুভব করেন—সেই ব্যথা বেদনার অন্তস্থলে যে অন্য এক মন এবং দনুর্লভ চিন্তা লনুকিয়ে আছে, তা আঁতিপাতি খনুঁজে বের করার জন্যে তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর জীবনের প্রথম দিককার গল্পে মোপাসাঁ বারবার এসেছে—তাঁকে প্রভাবিত করেছে। তিনি নিজেই আর এক মোপাসাঁ হয়ে উঠেছেন।

মণ্টোর প্রথম গল্প সংগ্রহ 'আতিশপারে'। এই গল্প সংগ্রহ পড়লে বোঝা যায় জীবনের শনুরনু থেকেই তিনি মানুষের ব্যথা-বেদনা এবং দনুঃখ কষ্ট সম্পর্কে গভীর ভাবে ভাবিত। মানুষের ওপর মানুষের যে নানান ধরনের অত্যাচার, সেই অত্যাচারের বিরনুদ্ধে তিনি চীৎকার করে উঠেছেন—বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু এই বেদনা এবং বিদ্রোহ মণ্টো কোন রাজনৈতিক এবং দর্শনের গভীর বিশ্বাস থেকে অনুভব করেননি, বরং বলা যেতে পারে, এ ছিল এক সংবেদনশীল লেখকের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার অনুরণন তাঁকে গল্প লেখার

প্রেরণা জুগিয়েছে। আর এই অত্যাচারিত—নির্যাতিত সমাজের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহের যে ঝাণ্ডা পরবর্তী জীবনে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা স্বাভাবিক এবং অভ্যস্ত মানবিক ও সামাজিক দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষও হোঁচট খেতে খেতে গ্রহণ করতে পারেননি। কখনও কখনও তিনি তাঁদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। কখনও বা হয়েছেন প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন। একদিন তাই তিনি উর্দু সাহিত্যের 'আতঙ্ক' হয়ে উঠলেন।

কেন তিনি 'আতঙ্ক' হয়ে উঠলেন—চিরাচরিত গল্প বলার সব কিছু প্রথা —এমন কি পরিচিত পাত্র পাত্রীকেও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুলে ধরলেন অন্ধকারের সেই চিরায়ত মানুষকে, যারা যুগ যুগ ধরে শোষিত নির্যাতিত। যাদের মানুষ দেখেও না দেখার ভান করে। মণ্টো তাদেরই দিকে তাকালেন। তাকিয়ে অনুসন্ধিৎসু আর নিবিড় মমতা দিয়ে তাদের মানসিক জগতকে দক্ষ সার্জেনের মতো ব্যবচ্ছেদ করে দেখলেন—পরখ করলেন অজানা অদেখা এক জগতকে, যে জগতকে এর আগে এমন ভাবে কেউ পরখ করে দেখার দুঃসাহস করেনি।

তার এই দুঃসাহস তাকে এমন এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছিল যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের এই 'ভদ্র' এই 'শিক্ষিত' এই 'মার্জিত' সমাজকেই আসলে আক্রোশে ব্যবচ্ছেদ করেছেন।

সাদাত হোসেন মণ্টোকে বুঝতে হবে—অনুধাবন করতে হবে এখানে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত মন নিয়ে। কারণ মণ্টো আমাদের চিরাচরিত ধ্যান ধারণার চিরাচরিত মার্গে বর্শা তুলে ধরেছেন। আর সেই বর্শা নিয়ে নিজের বুকেই অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে সমানে রক্ত ঝরিয়ে দিয়েছেন। আর রক্ত ঝরাতে ঝরাতে তিনি নিজেই জ্ঞান হারিয়েছেন—উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। তাই তিনি উর্দু সাহিত্যের 'আতঙ্ক' হয়ে উঠেছিলেন।

মণ্টোর লেখায় রাশিয়ান সাহিত্যের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না, তিনি নিজেও কোন দিন করার চেষ্টা করেননি। 'শগল' 'নারা' এবং 'নয়া কানুন'-এ তিনি মানুষের বিদ্রোহী আত্মাকে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু এ বিদ্রোহ ছিল অভাববোধ এবং প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। 'নয়া কানুনের', কোচওয়ান মংগু ইংরেজ সওয়ারিকে মেরে আর 'নারা'-র কেশবলাল শেঠজীকে গালি দিয়ে তাদের অপমান অভাব বোধ এবং তাৎক্ষণিক যে প্রতিক্রিয়া, তার প্রতিশোধ নেয়।

মণ্টোর গল্পে এই যে রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিদ্রোহ, তা ক্রমেই যৌন-বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহের মেজাজ তেমনি রয়ে গেল। তাঁর সেই আক্রমোন্মুখ 'আতঙ্কবাদী' যে অভিপ্সা এবং ব্যক্তিত্ব তাঁর মধ্যে কোন ফারাক সৃষ্টি করেনি। মণ্টো যৌন পবিত্রতার জায়গায় যৌন-প্রবৃত্তিকে যাচাই করতে চেয়েছেন—কারণ তিনি মনে করতেন, এই দুর্গন্ধ পচা গলা সমাজের নৈতিকতা যৌন পবিত্রতা নয়—যৌন অবদমনে। আর দার্শনিক অভিপ্রায়ে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে যৌন-বিকৃতি। তাই মণ্টোর মতো সংবেদনশীল লেখক এই যৌন বিকৃতির যে সামাজিক ও মানসিক রূপ তাটুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছেন। তাই তাঁকে 'অশ্লীল কথাশিল্পী এবং যৌন ভাবনায়উদ্দীপ্ত লেখক' হিসেবে চিহ্নিত করলে, তিনি তার জবাবে সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন ঃ

"যে যুগে আমরা বিচরণ করছি, সে যুগ সম্পর্কে যদি আপনি অপরিচিত হন, তবে আমার গল্প পড়ুন। যদি আপনি আমার গল্প সহ্য করতে না পারেন, তবে বুঝতে হবে এ যুগকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না। আমার মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তা এ যুগেরই ত্রুটি বিচ্যুতি। আমার লেখার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। যা নিয়ে আমাকে দোষারোপ করা হচ্ছে, তা বাস্তবে আধুনিক সমাজেরই দোষ। আমি অরাজকতা চাই না। আমি সেই সংস্কৃতি, সেই সভ্যতা আর সেই সমাজকেই টুকরো টুকরো করব, যা স্বয়ং নাঙ্গা—উলঙ্গ। আমি উলঙ্গতাকে কাপড় পরানোর কোন চেষ্টা করিনি। কারণ এ কাপড় পরানোর কাজ আমার নয়, দর্জির। লোকে বলে আমার কলম কালো। কিন্তু আমি কালো পাটাতনের ওপর কালো চক দিয়ে লিখতে চাই না। আমি সাদা চক এই জন্যেই হাতে তুলে নিয়েছি, যাতে কালো পাটাতনের যে কালোরূপ তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

এ জন্যেই বোধ হয় মণ্টো সুন্দর এবং মানবিকতা-সম্পন্ন মানুষকে এমন ভাবে চিত্রিত করেছেন, যাতে তথাকথিত 'ভালো মানুষের' নিচতা, সেই নিচতা যেন ঘৃণায় জর্জরিত হয়।

'নীলম' গল্পের রাজকিশোরের যে দীপ্যমান পবিত্রতা, তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার নোংরা আত্মার অভিলাষ। আর এই অভিলাষকে ঢেকে রেখেছে তার চাকচিক্যময় পবিত্রতা। কিন্তু 'বাবু গোপীনাথ'-এ আমরা দেখতে পাই বাবু গোপীনাথ বিলাসী, তার জীবনে পবিত্রতার কোন স্থান

নেই, কিন্তু সেই বিলাসীতার মধ্যে লুকিয়ে আছে আর এক গোপীনাথ, যে দরদী, সৎচরিত্র—মানুষের দুঃখ কষ্টে আকুল হয়ে ওঠে।

রাজকিশোর সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তার সুন্দর ব্যবহার এবং আত্মার পবিত্রতা দিয়ে সে সমাজকে মুগ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু রাজকিশোরের যে মানবাত্মা তা অনেক আগেই দফন হয়েছে। তার মধ্যে মানবিকতার কোন নাম-গন্ধ নেই। সে ধোকাবাজ—ঠগ। কিন্তু বাবু গোপীনাথের চরিত্র রাজকিশোরের ঠিক বিপরিত। রাজকিশোরের মতো সে অন্যের সঙ্গে ধোকাবাজী করে না—সে নিজেই নিজেকে ধোকা দেয়—নিজেই নিজেকে ঠকায়।

'বেশ্যা বাড়ি আর পীরের মাজার—এই দু'জায়গাতেই আমি আমার আত্মার শান্তির লাভ করি। সেখানে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু ধোকা আর শঠতায় পরিপূর্ণ। আর যে মানুষ নিজেকে ঠকাতে—ধোকা দিতে চায়, তার কাছে এর চেয়ে আর ভালো জায়গা কি হতে পারে।'—এ হচ্ছে বাবু গোপীনাথের চরিত্র।

রাজকিশোরের বিপরিত ধর্মী চরিত্র চিত্রাভিনেতা শ্যামকে মণ্টো সৃষ্টি করেছেন। শ্যামের মধ্যে আছে সহিষ্ণু-তার উষ্ণতা, আর রাজকিশোরের মধ্যে নিহিত অহংকারের এক হিম শীতলতা। শ্যাম মদ্যপ কিন্তু তার ছিল বিশাল হৃদয়। যে হৃদয়ে কোন সার্থপরতা নেই। বাবু গোপীনাথ আর শ্যাম মদ্যপ হওয়া সত্ত্বেও তাদের চরিত্রের মধ্যে এমন ভব্যতা ছিল, যা রাজকিশোরের মধ্যে ছিল না। বরং তার মধ্যে ছিল জঘন্যতা—নোংরামো। তাই নীলম রাজকিশোর সম্পর্কে বলে, 'আমি তার ঠোঁটে এক সর্বনাশা জ্বালা-ধরা চুম্বন করলাম, আমার মনে হল, ও যেন এক হতবৃদ্ধের মতো আমার চুম্বনের স্পর্শে শীতল হয়ে গেল।' রাজকিশোর সম্পর্কে এ এক অভিমানী তরুণীর উক্তি।

যারা বাইরে এবং অন্তরে সত্য সত্যই 'ভালো মানুষ' মণ্টো তাদের নিয়ে কলম ধরেননি। কলম ধরার প্রয়োজনও অনুভব করেননি। মণ্টো অহমদ নদিম কাসবী সম্পর্কে বলেন, 'এই সত্যবাদী ভদ্র এবং ভালো মানুষ সম্পর্কে আমি কি লিখব—'তিনি সত্যিই ভদ্র।'

মণ্টো যৌনতাকে যে ভাবে চিত্রিত করেছেন, তা অন্য যৌন লেখকের মতোই হয়তো আপাত দৃষ্টিতে একই রকম বাস্তবধর্মী। কিন্তু মণ্টো

এমন সমস্যা তার মধ্যে উপস্থিত করেছেন যা যৌন সর্বস্বতাকে এক পাশে সরিয়ে অন্য এক সামাজিক এবং মানবিক সমস্যা বিজয়ীর মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আর তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন এক থেকে এক খারাপ মানুষ—সে দালাল ব্যাভিচারী খুনি গুন্ডা বেশ্যা যেই হোক না কেন, তার মধ্যেও আছে টিমটিম প্রদীপ শিখা। যে প্রদীপ শিখা মশালের রূপ ধারণ করার মতোই শক্তি রাখে। সমাজ যদি তার কৃত্রিমতা কপটতা এবং ভণ্ডামি ইত্যাদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, তবে জীবন জ্যোতির্ময় সুস্থ এবং আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু মণ্টো তাঁর গল্প পাঠককে এমন এক 'শক' দিতে অভ্যস্ত যে, সাধারণ পাঠক সেই 'শক' গ্রহণ করতে না পেরে ট্রাজিকতায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন। আর মণ্টোকে গালি দিতে থাকেন।

মণ্টোর কাছে তাই প্রাকৃতিক মানুষই সাচ্চা মানুষ। এই মানুষ তাই দেবতাও নয়, পশুও নয়। ডি এইচ লরেন্সের এই সিদ্ধান্তের প্রতি তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। নিছক কোন ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁর ছিল না। বরং বলা যায় তিনি সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় কুসংস্কার-মুক্ত একজন নাস্তিক মানুষ—যে নাস্তিকতা মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে—তাকে মহীয়ান করে তোলে। এই কুসংস্কারচ্ছন্ন সমাজকেই মণ্টো তাঁর সর্ব শক্তি দিয়ে বারবার বিদ্ধ করেছেন এবং নিজেকেও তাঁর হাত থেকে রেহাই দেননি। মণ্টোর এই বিশ্বাস অন্তত তাঁর দুটি গল্পের মধ্যে অনায়াস ভাবে এসেছে—যেখানে তাঁর প্রাকৃতিক মানব বন্য যুগের আদি মানব নয় বরং নৈতিকতায় অভিসিক্ত এ যুগের আর এক দীব্য মানুষ।

'পাঁচ দিন' গল্পে মণ্টো এমন একজন প্রফেসারের চরিত্র আঁকেন যে সারা জীবন ধরে তার যে দৈহিক ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাকে জোর করে দাবিয়ে রাখেন। কিন্তু জীবনের শেষ পাঁচ দিনে সে একটি মেয়ের যৌন সংসর্গে আসে। এবং তার দেহে নিজের ক্ষয় রোগের বিজানু দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু মৃত্যুর সময় সে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে, তার জীবন ফেরেববাজীতে ভরপুর। 'এক স্বাভাবিক ইচ্ছাকে হত্যা করা হয়তো অনেক বড় মহান ব্যাপার, কিন্তু তার চেয়েও মহান হচ্ছে মানুষকে হত্যা করা। মানুষের এই প্রাকৃতিক ইচ্ছাকে অবদমিত করা জুলুম ছাড়া আর কি।'

কিন্তু 'বাসত' গল্পে বাসত তার নিজের যে দুর্বলতা, সেই দুর্বলতাকে জয় করে। সে জানত তার স্ত্রী এক অবৈধ মৃত সন্তানকে জন্ম দিয়েছে।

কিন্তু সে এই অবৈধ সন্তানের রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত না করে, বরং নিজের হাতে সে শিশু সন্তানকে কবর দেয়। কবর দিয়ে সে তার স্ত্রীর এক প্রচণ্ড পাপানুভূতির যে বেদনা, সেই বেদনাতে ভালোবাসার মধুর স্পর্শ লাগায়।

'মোজেল'-এর মধ্যেও আমরা এমনই এক দুর্লভ মানবিক সত্তাকে দেখি—যে সত্তা সচারচর দেখা যায় না। মোজেল মুসলমান পরিবার পরিবেষ্টিত এক ইহুদি মেয়ে। অনেক ঘাটের জল-খাওয়া। সে কোন সমাজ কোন ধর্ম কোন নৈতিকতার পরওয়া করে না। কিন্তু তার মধ্যে এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতি লুকিয়ে ছিল, যা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। আর যে প্রস্ফুটিত অনুভূতি বুকে নিয়ে সে তার একদা প্রেমিক ত্রিলোচনের বাগদত্তার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে নিজের প্রাণ স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে। মোজল তথাকথিত ধর্ম নৈতিকতা সব কিছুর যে চিরায়ত ধারণা তা ভেঙে তছনছ করে দেয়।

'স্বরাজের জন্যে' গল্পের গোলাম আলীকে তার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং অভিলাষ, তা যদি পূরণ করতে দেওয়া হত, তবে সে এক মহান ব্যক্তিতে এবং সমাজের আর দশ জনের কাজে লাগতে পারত। কিন্তু সে এক দৈহিক এবং মানসিক রোগের শিকার। এ রকম মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই নপুংসক হয়—কল্পনায় নিজের ইচ্ছা পূর্তি করে এবং কাপুরুষে পর্যবসিত হয়। ফলে সে নিজেই নিজেকে দেখে ভয় পায়।

'স্বরাজের জন্যে' গল্পে মণ্টো স্বাধীনতা আন্দোলনের এমন এক কালকে এবং এমন এক নেতৃত্বকে দেখিয়েছেন, যে নেতৃত্ব সমগ্র আন্দোলনকে নিস্তেজ—নপুংসক করে দিয়েছে। সেই কালের এই 'মহান,' 'দাপটে', নেতা বাবাজী আর কেউ নন, স্বয়ং গান্ধীজী। আর তার আশ্রম হচ্ছে সবরমতী আশ্রম, যে আশ্রমে সুন্দরী মেয়েরা ঘি-দুধ খেয়ে লাবণ্যে উদ্ভাসিত, আর পুরুষরা হাড়গিলে—ধুকছেত ব্রহ্মচর্যের মহান ব্রত পালন করতে করতে নিঃশেষিত হচ্ছে।

'স্বরাজের জন্যে' পড়তে পড়তে চমকে উঠতে হয়। মনে হয় কে বলেছে, মণ্টো রাজনীতির উত্থান-পতন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, বা ভাবতেন না।

তিনি বলেছেন, বাবাজী গোটা আন্দোলনকে নপুংসক করে দিয়েছে। এই নপুংসক আন্দোলন আর কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না।

তাই এই আন্দোলনের একজন উৎসাহী জঙ্গী কর্মী গুলাম আলী ব্রহ্মচর্য

পালন করতে করতে রোগের শিকার হয়।

'স্বরাজের জন্যে' গল্পটি মণ্টোর এক অসমান্য রাজনৈতিক গল্প। পড়তে পড়তে মনে হয় সেই রাজনৈতিক তাৎপর্য আজও কংগ্রেসের মধ্যে অটুট। আজও সেই রাজনীতি নিয়ে তারা ফেরেববাজী করছে। দেশকে ক্রমেই পঙ্গু অথর্ব এবং নপুংসক করে তুলছে।

উর্দু সাহিত্যকে মণ্টো অনেক অসাধারণ গল্প বা অফসানা উপহার দিয়েছেন···তার মধ্যে ক্ষত, কালো সালোয়ার, মমী, মোজেল, খুলে দাও, টোবা টেকসিং বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'টোবা টেকসিং' লেখার জন্যে তাকে কয়েক মাস পাগলা গারদে পাগলদের সঙ্গে কাটাতে হয়। দেশ বিভাগের ওপর এমন গল্প আর দুটি ভারতীয় সাহিত্যে লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ।

তাঁর 'বু', ঠাণ্ডা গোশ্ত', 'কালো সালোয়ার' 'ধোঁয়া' এবং 'ওপর নিচে এবং মাঝখানের' বিরুদ্ধের অশ্লীলতার মামলা দায়ের করা হয়। 'খুলে দাও' গল্প প্রকাশ করার জন্যে উর্দু মাসিক পত্রিকা 'নুকশ' বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর 'ঠাণ্ডা গোশ্ত'এ-র জন্যে 'জাবেদ'-কে জরিমানা দিতে হয়। 'ওপর নিচে এবং মাঝখানে-র' এক কিস্তি ছাপার পর সরকার বন্ধ করে দেয়। ফলে কোন পত্রিকাই আর পরবর্তী কিস্তিগুলো ছাপতে রাজি হয় না। নিজেই পরবর্তী সময়ে বই হিসেবে ছাপিয়ে বের করেন।

উর্দু সাহিত্যক মুমতাজ মুফতির গল্পের মতো তাঁর গল্পে হয়তো তেমন কোন গভীর মনোবিশ্লেষণ নেই, কিন্তু দেহের এক প্রচণ্ড আকুতি এবং বিশ্লেষণ আছে। বোধহয় সে জন্যেই মণ্টোর গল্পকে বড় বেশী অশ্লীল বলে মনে হয়। আর তাই তাঁর গল্পে বারবার সতেজ—তরতাজা গোশ্ত, রাখ-ঢাক হীন—উলঙ্গ গোশ্ত, লিপস্টিক-মাখা বাসি গোশ্ত, গোশ্তের নানা রঙ নানা মাপ নানা টুকরো আর গোশ্ত থেকে উদ্গারিত ধোঁয়া দেখা যায়। এই 'শরীর সর্বস্বতা' সম্পর্কে তাই সমালোচক আহমদ নদিম কাসিমীর বক্তব্যকে পালটা আক্রমণ করে মণ্টো বলেন :

"তুমি মেয়েদের শরীরের রহস্য কতটুকু জানো? তুমি এখনও বিয়ে-শাদি পর্যন্ত করনি। মদও চেখে দেখনি। নারীর দেহে মোপাসাঁ জল বিন্দুর যে অসাধারণ রূপ সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টি তুমি কিভাবে অনুভব করবে? যদি তিনি এই রূপ এবং রঙের যথার্থ বর্ণনা না দিতেন তবে

সেই নারীকে কপট বলে মনে হত। জলের এই ছোট ছোট বিন্দু তার জীবনে এনে দিয়েছে ঐশ্বর্য। নিশ্চয়ই কৃষকদের নিয়ে গল্প লিখেছ। তার অর্থ এ নয় যে, তুমি কৃষক রমণীদের মনোবৃত্তি জানো বা বুঝে ফেলেছ। মেয়েদের নিয়ে লেখার সময় মেয়ে হয়ে যেতে হয়। তলস্তয় কখনও কখনও গান্ধীপনা করেছেন। কিন্তু তুমি কি মনে কর আনা কারনিনার পায়ের ওপর লেখার সময় তেমন কোন ইচ্ছা কি তাঁর মধ্যে জাগরূক হয়েছিল, যেমন জাগরূক হয়েছিল মেপাসাঁর তাঁর নায়িকার শরীরের ওপর গোলাপী আভার জলের বিন্দু দেখে। শোন, আহমদ নদিম কাসিমী, তুমি হচ্ছ সাহিত্যের বিদেশ মন্ত্রী। আর আমি হচ্ছি গৃহমন্ত্রী।"

মণ্টোর এই যে নগ্নতা, বাস্তবতঃ তা হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার যে পাপ, সেই পাপের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ। আর এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই মণ্টোর ক্ষোভ ঘৃণা এবং ভালোবাসাও। কৃষণ চন্দর ভাষায় বলা হয় 'কে যেন তার গল্প থেকে সমস্ত রকম কোমলতা এবং মিষ্টতা ছিনিয়ে নিয়েছে। বোধ হয় সে স্বয়ং তার গল্প থেকে সমস্ত কোমলতা এবং মিষ্টতাকে ধাক্কা দিতে দিতে বের করে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস কোন উৎপীড়কের মনোভাবের প্রভাব থেকে সে এ কাজ করেছে। 'শালা নিকাল যা, নিকাল যা—জিন্দেগী বড়া কঠিন'।

তাঁর গল্পে তাই আবেগের কোন স্থান নেই। সমস্ত আবেগকে তিনি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছেন।

মণ্টোর সমস্ত গল্পকে অনুধাবন করতে হবে—বুঝতে হবে এই রুক্ষ মাটির ওপর দাঁড়িয়ে—যেখানে কোন মায়া কোন মমতা কোন ভালোবাসা নেই। আছে শুধু উৎপীড়ন—লাঞ্ছনা।

প্রথিতযশা প্রগতিশীল কবি সর্দার জাফরীর ভাষায় মণ্টো সম্পর্কে বলা যায়ঃ

"সে ছিল সংবেদনশীল, তাই তাকে দু'বার পাগলা গারদে যেতে হয়। তার মধ্যে কোন লুকোচুরি—গোপনীয়তা ছিল না বলে তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। মেজাজী ছিল বলে দুশমনদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। অভিমানী ছিল তাই না খেয়ে মরতে হয়েছে। প্রথম থেকেই ছিল পিপাসার্ত সেজন্যে মদ ধরে। বেঁচে থাকার কোন পথ খুঁজে বের করতে না পেরে মারা গেল। কিন্তু সে ছিল শিল্পী, তাই মরেও বেঁচে

রইল। আপনি হয়তো শেষে জিজ্ঞেস করবেন, এত রুক্ষ এত খারাপ কথা সে কেন বলত? এত রুক্ষ কথা সে বলত, কারণ এই সমাজই তাকে এমন করেছে। তার মতো হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষও এমনি হয়েছে। তার রুক্ষ কথার ধরন, আমাদের অবশ্যই ক্ষতি করেছে, লাভ হয়েছে অনেক অনেক বেশী। মণ্টোর এই রুক্ষ খারাপ কথা আমাদের সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ—এই সম্পদকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব। আর সে সম্পদ আমাদের জীবিত রাখবে।'

মণ্টোর সৃষ্টির ব্যথা বেদনা তীক্ষ্মতা ব্যক্ত এখানে,—এই রুক্ষ খারাপ শব্দ সম্ভারের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আর যে রুক্ষ শব্দ সম্ভার এবং মেজাজ থেকে খুঁজে নিতে হবে সেই অজানা—অদেখা জগতের এক প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহকে। আর যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিতে গিয়ে একজন মানুষ ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত ভুখা এবং নাঙ্গা হয়েছেন। তাঁর দেশ—পাকিস্তান সরকার তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করেছেন—পাগলা গারদে পাঠিয়েছেন। পাঠিয়ে দেশের 'শালীনতা'—দেশের মর্যাদা', ধর্মের পবিত্রতা' রক্ষা করতে চেয়েছেন।

মণ্টো একজন বিতর্কিত লেখক। আমার মতে তিনি বিতর্কিতই থেকে যান। কারণ বিতর্কের ঝড়ই তাঁকে জীবন্ত এবং সজীব করে রাখবে।

কমলেশ সেন

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

টোবা টেকসিং

দেশ বিভাগের দু-তিন বৎসর পর পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানের সরকারের খেয়াল হল কয়েদীদের মতো পাগলদেরও আদান প্রদান হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ যে সব মুসলমান পাগল হিন্দুস্থানের পাগলা গারদে আছে তাদের পাকিস্তানে এবং যে সব হিন্দু ও শিখ পাকিস্তানের পাগলা গারদে আছে তাদের হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

জানি না এ ঠিক ছিল কি বেঠিক ছিল। যাই-ই হোক, বুঝদার মানুষের রায় অনুসারে উচ্চস্তরের কনফারেন্স হল এবং শেষে এক দিন পাগলদের আদন-প্রদানের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান চালানো হল। যে সব মুসলমান পাগলদের আত্মীয়-স্বজন হিন্দুস্থানে আছে তাদের সেখানেই রাখা ঠিক হল। আর পাকিস্তান থেকে যেহেতু সব হিন্দু এবং শিখ হিন্দুস্থানে চলে গিয়েছে তাই কাউকেই আর এখানে রাখার কথাই ওঠে না। যত হিন্দু এবং শিখ পাগল ছিল তাদের পুলিশের পাহারায় সীমান্তে পেঁছে দেওয়া হল। ওদিককার কোন খবর নেই। কিন্তু এ দিকে লাহোরের পাগলা গারদে এই আদান-প্রদানের খবর পেঁছুলে খুব মজার মজার ঘটনা ঘটল। এক মুসলমান পাগল, যে বারো বৎসর ধরে প্রতিদিন নিয়মিত 'জমিদার' পত্রিকা পড়ে আসছে, তাকে তার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করল, "মৌলভী সাহেব, এই পাকিস্তান বস্তুটা কি?" মৌলভী সাহেব খুব গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করে বলল, "হিন্দুস্থানের মধ্যে এ এমন এক জায়গা যেখানে খুর তৈরী হয়।"

মৌলভী সাহেবের উত্তর শুনে তার বন্ধু আর কোন কথাই বলল না।

একজন শিখ পাগল আর একজন শিখ পাগলকে জিজ্ঞেস করল, "সর্দারজী, আমাদের হিন্দুস্থানে কেন পাঠানো হচ্ছে? আমার তো ওখানকার ভাষা জানা নেই।"

অন্য শিখ পাগলটি হেসে বলল, "আমার কিন্তু হিন্দুস্থানের ভাষা জানা আছে। তবে হিন্দুস্থানীরা খুব ডাঁটের মাথায় চলা-ফেরা করে।"

একদিন এক মুসলমান পাগল স্নান করতে করতে এমন জোড়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিল যে, পা পিছলে সে শানের ওপর পড়ে

বেহুশ হয়ে গেল। এমন কিছু পাগল ছিল যাদের ঠিক পাগল বলা যায় না। এদের অধিকাংশই ছিল খুনী। এই সব খুনীদের সঙ্গে জড়িত অফিসাররা ফাঁসীর দড়ি থেকে তাদের বাঁচানোর জন্যে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে এখানে পাঠিয়েছে।

এরা অবশ্য কিছু কিছু বোঝে, দেশ বিভাগ কেন হয়েছে এবং পাকিস্তান কি। কিন্তু সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তারাও বিশেষ কিছু জানে না। খবরের কাগজ থেকে সমস্ত ঘটনা আঁচ করা সম্ভব নয়। আর পাহারাদার সিপাইরাও অজ্ঞ এবং তাদের ব্যবহার ভীষণ রুক্ষ। ওদের আলাপ-আলোচনা থেকে কোন কিছুই বেরিয়ে আসে না। তারা কেবল এতটুকুই জানে মুহম্মদ আলী জিন্না নামে একজন মানুষ আছেন, যাঁকে কায়েদ-ই-আজম বলা হয়। ইনি মুসলমানদের জন্যে এক পৃথক দেশ বানিয়েছেন—যার নাম পাকিস্তান। কিন্তু এই পাকিস্তান কোথায় আছে? এর উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। কারণ পাগলা গারদের এরা সবাই উন্মাদ। যাদের মাথা একেবারে বিগড়ে যায়নি, তাদের চিন্তা তারা পাকিস্তানে আছে, না হিন্দুস্থানে আছে। যদি হিন্দুস্থানে থাকে তবে পাকিস্তান কোথায়, আর যদি পাকিস্তানে থাকে তবে এই জায়গা কিছুদিন আগেও হিন্দুস্থান ছিল। একজন পাগলা হিন্দুস্থান পাকিস্তান, পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের এমন চড়কি পাকের মধ্যে পড়ল যে তার মাথা আরো বিগড়ে গেল। ঝাঁট দিতে দিতে সে একদিন এক গাছের ডালে বসে পাকিস্তান এবং হিন্দাস্থানের মৌলিক সমস্যার ওপর লাগাতার দু'ঘন্টা ভাষণ দিল। সিপাইরা তাকে নীচে নামতে বললে সে আরো ওপরের ডালে চড়ে বসল। তাকে ধমকানো এবং ভয় দেখানো হলে সে বলল, "আমি হিন্দুস্থানেও থাকতে চাই না, পাকিস্তানেও না। আমি এই গাছের ওপরেই থাকব।"

বুঝিয়ে-সুজিয়ে তার রাগ ঠাণ্ডা করা হলে সে গাছ থেকে নেমে এসে হিন্দু এবং শিখ বন্ধুদের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। তাকে ছেড়ে এরা সব হিন্দুস্থানে চলে যাবে এই চিন্তায় তার মন দুঃখে ভরে উঠল।

এখানে একজন মুসলমান এম. এস. সি. পাশ রেডিও ইঞ্জিনিয়ার পাগল ছিল। অন্যান্য পাগলদের থেকে তার একটু বিশেষত্ব ছিল। বাগানের বিশেষ এক অংশে সে দিন-ভর ঘুরে বেড়াত, হঠাৎ-ই তার মধ্যে এক পরিবর্তন দেখা দিল। সে তার সমস্ত জামা-কাপড় খুলে পাহারাদারকে

দিল এবং উলঙ্গ হয়ে সারা বাগান ঘুরে বেড়াতে লাগল।

চনয়ুটের এক মুসলমান পাগল, যে উন্মাদ হওয়ার আগে মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী ছিল, হঠাৎ-ই সে স্নান-করা বন্ধ করে দিল। তার নাম ছিল মুহম্মদ আলী। একদিন সে তার জানালা দিয়ে ঘোষণা করল সে মুহম্মদ আলী জিন্না। তাকে দেখে একজন শিখ পাগল মাস্টার তারা সিং হয়ে গেল। সামনা-সামনি হলে খুনো-খুনীর ভয় ছিল বলে দুর্ধর্ষ পাগলদের পৃথক পৃথক সেলে বন্ধ করে রাখা হল।

লাহোরের এক তরুণ হিন্দু উকিল, যে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে পাগল হয়েছিল—সে যখন শুনল অমৃতসর হিন্দুস্থানে পড়েছে তখন তার খুব কষ্ট হল। কারণ এই শহরের এক হিন্দু তরুণীর সঙ্গে তার এক সময় প্রেম ছিল। যদিও সেই তরুণী উকিলকে আঘাত দিয়েছিল তবুও সে পাগলা গারদের এই পরিবেশে থেকেও তাকে ভুলতে পারেনি। তাই সে হিন্দু এবং মুসলমান সেই সব নেতাদের গালাগালি করত যারা একজোট হয়ে হিন্দুস্থানকে দু' টুকরো করেছে। তার প্রেমিকা হিন্দুস্থানী হয়েছে আর সে পাকিস্তানী।

আদান-প্রদানের কথা যখন শুরু হল, তখন অন্যান্য পাগলরা তাকে বুঝালো এ জন্যে তার দুঃখ করে লাভ নেই। যে হিন্দুস্থানে তার প্রেমিকা আছে সেখানে তাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু লাহোর ছাড়তে সে একেবারেই রাজী নয়। কারণ তার বিশ্বাস, অমৃতসরে তার প্রাকটিস চলবে না। ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে দু'জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাগল ছিল। তারা যখন বুঝতে পারল হিন্দুস্থানকে স্বাধীনতা দিয়ে ইংরেজরা চলে গিয়েছে, তখন তাদের খুব দুঃখ হল। তারা দু'জন লুকিয়ে লুকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভীষণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল, পাগলা গারদে তাদের পোজিসন কি রকম হবে? ইউরোপিয়ান ওয়ার্ড থাকবে, না তুলে দেওয়া হবে? ব্রেকফাস্ট পাওয়া যাবে, না পাওয়া যাবে না? ডবল রুটির বদলে কি তাদের তন্দুরি খেতে হবে?

একজন শিখ ছিল—যাকে পাগলা গারদে দেওয়ার পর দীর্ঘ পনেরো বৎসর পার হয়ে গিয়েছে। সব সময়েই তার মুখ দিয়ে এক বিচিত্র ভাষা বের হত "ও পড় দি গিড়-গিড় দি এক্স দি বে ধ্যানা দি, মুংগ দি, দাল আও দি লালটেন।" দিনে বা রাত্রে কোন সময়েই সে শুতো না। পাহারাদাররা

বলতো এই দীর্ঘ পনেরো বৎসরে সে এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমোয়নি। — শোয়ওনি। হ্যাঁ, কখনো কখনো বা কোন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াত। সব সময় দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে তার পা দুটি সোজা হয়ে গিয়েছিল। দু' উরু ফুলে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই ভীষণ কষ্ট সত্ত্বেও সে আরাম করত না। হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের পাগলদের আদান-প্রদান নিয়ে পাগলা গারদে যখন কোন আলাপ-আলোচনা হত তখন সে খুব মনোযোগ দিয়ে তা শুনতো। কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করত, তোমার কি মনে হয়, তখন সে উত্তর দিত, "ও পড় দি গিড়-গিড় দি এক্স দি বে ধ্যানা দি, মৎগ দি, দাল আও দি, পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট।"

পরে সে আও দি পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের জায়গায় যোগ করল আও দি টোবা টেকসিং এবং সব পাগলদের জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করল, যেখানে সে থাকত সেই টোবা টেকসিং কোথায়? কিন্তু তারা কেউ-ই জানত না টোবা টেকসিং পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে। যারা তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করত, তারা নিজেরাই চড়কি পাকে পড়ে যেত। শিয়ালকোট প্রথমে হিন্দুস্থানে ছিল, এখন শুনছে পাকিস্তানে। কে জানে, যে লাহোর পাকিস্তানে, আগামী কালই হয়তো তা হিন্দুস্থানে চলে যাবে—কিম্বা সারা হিন্দুস্থানই পাকিস্তান হয়ে যাবে। এমন কোন্ মানুষ আছে যে তার বুকে হাত রেখে বলতে পারে হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান হঠাৎ একদিন লোপাট হয়ে যাবে না—আর দুনিয়ায় যার কোন নাম নিশানাই থাকবে না।

ঝ'রে পড়তে পড়তে এই শিখ পাগলের মাথায় খুব অল্প চুলই আর অবশিষ্ট ছিল। স্নান করা সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। তার দাড়ি আর মাথায় চুল জট পেকে গিয়েছিল। ফলে তার চেহারা ভয়ানক দেখাচ্ছিল। কিন্তু এই মানুষটি ছিল একেবারে সোজা। পনেরো বৎসরে সে একদিনও কারও সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি করেনি। পাগলা গারদের পুরনো চাকর তার সম্পর্কে শুধু এইটুকুই জানে, টোবা টেকসিং-এ একদিন তার জমিদারী ছিল। সে ছিল পয়সাওয়ালা জমিদার। কিন্তু হঠাৎ-ই তার মাথার গণ্ডোগোল হয়। তাই তার আত্মীয়রা মোটা মোটা লোহার শিকলে বেঁধে তাকে এখানে নিয়ে আসে' মাসে একবার তারা তার খোঁজ-খবর নিতে আসত। কিন্তু যেদিন থেকে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের গণ্ডোগোল শুরু হল সেদিন থেকে তারা আর আসে না।

তার নাম ছিল শবন সিং। কিন্তু সবাই তাকে টোবা টেকসিং বলত। সে আদৌ জানত না আজ কোন্ দিন কোন্ মাস, কোন্ বৎসর। কিন্তু প্রতি মাসে যে সময় তার আত্মীয়-স্বজনরা তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসত তখন সে আপনার থেকেই বুঝতে পারত। সে পাহারাদারদের বলত তার সাক্ষাৎ-এর দিন আসছে। ঐ দিন সে খুব ভালোভাবে স্নান করত, গায়ে বেশ করে সাবান মাখতো আর মাথায় তেল দিয়ে চিরুনি করত। নিজের জামা কাপড় সে কোন দিনই বের করত না, কিন্তু সেদিন সে তা বের করে পরত। আর সেজে-গুজে তাদের সঙ্গে দেখা করতে যেত। তারা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে, সে কোন উত্তরই দিত না। কখনো কখনো শুধু বলত, "ও পড় দি গিড়-গিড় দি লালটেন।"

তার একটি মেয়ে ছিল—প্রতিমাসে এক আঙুল করে বেড়ে উঠতে উঠতে আজ সে পনেরো বৎসরের যুবতীতে পরিণত হয়েছে। শবন সিং তাকে চিনতেই পারেনি। যখন সে বাচ্চা ছিল তখন সে তার বাবাকে দেখে খুব কাঁদতো। আর যুবতী হওয়ার পর তার চোখ দিয়ে শুধু অঝোরে ঝরে পড়ত অশ্রুধারা।

পাকিস্তান আর হিন্দুস্থানের কাহিনী শুরু হলে সে অন্য পাগলদের জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করল, টোবা টেকসিং কোথায়? সন্তোষজনক কোন উত্তর না পেয়ে তার চিন্তা দিন দিন বাড়তে লাগল। এখন আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎও হয় না। আগে সে নিজের থেকেই বুঝতে পারত তারা তাকে দেখতে আসছে। হৃদয় তাকে তাদের আসার খবর জানিয়ে দিত। এখন সেই হৃদয়ের আওয়াজটুকুও তার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

তার খুব ইচ্ছে করত যারা তাকে ভালোবাসত, তার জন্যে ফল-মিঠাই আর কাপড় নিয়ে আসত—তারা আসুক। সে যদি তাদের জিজ্ঞেস করত, টোবা টেকসিং কোথায় তবে তারা নিশ্চয় সত্যি কথাই বলত। সে জানতে পারত টোবা টেকসিং পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে। সে জানে যেখানে তার জমিদারী ছিল সেই টোবা টেকসিং থেকেই তারা এখানে আসত।

পাগলা গারদে আর একজন উন্মাদ ছিল সে নিজেকে খোদা বলে জাহির করত। একদিন শবন সিং তাকে জিজ্ঞেস করল, টোবা টেকসিং পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে। কিন্তু সেই খোদা তার অভ্যাস মতো হো হো করে হেসে

বলল, "টোবা টেকসিং পাকিস্তানেও নয়, হিন্দুস্থানেও নয়। কারণ আমি এখনও হুকুম জারী করিনি।"

শবন সিং এই খোদাকে কয়েকবার অনুনয়-বিনয় করে বলল, "তুমি হুকুম দিয়ে দাও না, তা হলেই তো ঝগড়াট চুকে যায়।" কিন্তু খোদা ভীষণ ব্যস্ত ছিল, কারণ তার আরো কয়েকটি হুকুম জারী করার বাকী ছিল। একদিন শবন সিং তার ওপর ভীষণ চটে গিয়ে বলল, "ও পড় দি গিড়-গিড় দি এক্স দি বে ধ্যানা দি, মুংগ দি, দাল আও ওয়াহে গুরু দি খালসা এ্যান্ড ওয়াহে গুরুজী দি ফতহ—জো বোলে সো নিহাল সত্ শ্রী অকাল।"

তার এই কথার অর্থ ছিল তুমি মুসলমানদের খোদা—তুমি যদি শিখদের খোদা হতে তবে নিশ্চয়ই আমার কথা শুনতে।

আদান-প্রদানের কয়েকদিন আগে টোবা টেকসিং-এর এক মুসলমান বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে এল। এর আগে সে কোন দিন তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। শবন সিং তাকে দেখে একদিকে সরে দাঁড়াল এবং ফিরে যেতে লাগল। কিন্তু সিপাইরা তাকে ধরে বলল, "তোমার বন্ধু ফজলুদ্দীন।"

শবন সিং ফজলুদ্দীনকে এক নজর দেখে বিড়-বিড় করে কিছু বলতে লাগল। ফজলুদ্দীন এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি তোমার সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি, তোমার বাড়ির সবাই ভালোভাবেই হিন্দুস্থানে পেঁছে গিয়েছে। আমার পক্ষে যতখানি সম্ভব সাহায্য করার তা করেছি। কিন্তু তোমার মেয়ে রূপ কাউর..."

বলতে বলতে ফজলুদ্দীন থেমে গেল। শবন সিং কোন কিছু চিন্তা করতে লাগল।—"আমার মেয়ে রূপ কাউর!"

ফজলুদ্দীন থেমে থেমে বলতে লাগল, "হ্যাঁ...ও—ও...ঠিক-ঠাক আছে...ওদের সাথেই চলে গিয়েছে।"

শবন সিং চুপ করে থাকল। ফজলুদ্দীন বলতে লাগল, "ওরা আমাকে তোমার খোঁজ-খবর নিতে বলেছে। আমি শুনেছি তুমি হিন্দুস্থানে যাচ্ছ—ভাই বলবীর সিং এবং ভাই বধওয়া সিংকে আমার সেলাম দিও—আর বোন অমৃত কাউরকেও। ভাই বলবীর সিংকে বলো সে যে দুটি বাদামী রঙের মোষ ছেড়ে গিয়েছে তার মধ্যে একটি মর্দা বাচ্চা দিয়েছে আর

একটি মাদী বাচ্চা। কিন্তু চোদ্দ দিনের মাথায় মাদী বাচ্চাটা মরে গিয়েছে। তোমাদের জন্যে আমার কিছু করার থাকলে বলো, আমি আমার সাধ্য মতো করব। তোমার জন্যে সামান্য একটু মরুণ্ডে নিয়ে এসেছি।"

শবন সিং মরুণ্ডের পুটলি নিয়ে তার পাশে যে সিপাইটা দাঁড়িয়ে ছিল তার হাতে দিল। ফজলুদ্দীনকে জিজ্ঞেস করল, "টোবা টেকসিং কোথায় ?" ফজলুদ্দীন আশ্চর্যের সঙ্গে বলল, "কোথায় ? কেন যেখানে ছিল সেখানেই আছে।"

শবন সিং আবার জিজ্ঞেস করল, "পাকিস্তানে, না হিন্দুস্থানে ?" ফজলুদ্দীন থতমত খেয়ে বলল, "হিন্দুস্থানে—না না পাকিস্তানে।" শবন সিং বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল—"ও পড় দি গিড়-গিড় দি এন্না দি বে ধ্যানা দি, মংগ দি, দাল আওদি পাকিস্তান এ্যান্ড হিন্দুস্থান অফ দি দুর ফিটে মুঁহ।"

আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে আসা-যাওয়ার পাগলদের নামের তালিকা এসে গিয়েছিল এবং আদান-প্রদানের তারিখও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যখন লাহোরের পাগলা গারদ থেকে লরি বোঝাই করে হিন্দু ও শিখ পাগলদের সীমান্তের দিকে পাঠানো হল তখন বেশ শীত পড়ে গিয়েছিল। ভারপ্রাপ্ত অফিসাররাও পাগলদের সঙ্গে ছিলেন। উভয় পক্ষের সুপারেনটেনডেন্ট পরস্পরের সঙ্গে দেখা করলেন, এবং অফিসিয়াল কাজ কর্ম শেষ হওয়ার পর আদান প্রদান শুরু হয়ে গেল। আদান-প্রদান সমস্ত রাত্রি ধরে চলল।

পাগলদের লরি থেকে নামানো এবং অন্য অফিসারদের হেফাজতে দেওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল ; অনেকে তো লরি থেকে নামতেই চাইছিল না। যারা লরি থেকে নেমেছিল তাদের সামলানো ছিল এক সাধ্যাতীত ব্যাপার। কারণ তারা এদিক ওদিক ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল। যারা একেবারে উলঙ্গ ছিল তাদের কাপড় পরাতে গেলে তা টেনে খুলে ফেলছিল। কেউ কেউ খিস্তি-খাস্তা করছিল, কেউ বা গান গাইছিল। নিজেদের মধ্যে মারপিট ঝগড়াঝাটিও পুরোদমে চলছিল—কান্নাকাটি করছিল। কান পেতে শোনা যাচ্ছিল না। উন্মাদ মেয়েদের গণ্ডোগোল ছিল একটু ভিন্ন ধরনের—সর্দি তাদের এতো বেশী ছিল যে দাঁতে দাঁত ঠক ঠক করে বাজছিল।

অধিকাংশ পাগলই এই আদান-প্রদানকে মোটেই পছন্দ করছিল না। তারা বুঝতেই পারছিল না নিজেদের জায়গা থেকে তুলে তাদের কোথায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। যারা অল্প-বিস্তর আন্দাজ করতে পারছিল তারা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'—'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' ধ্বনি দিচ্ছিল। দু-তিন বার হাতা-হাতি হতে হতে থেমে গেল, কারণ কোন-কোন মুসলমান এবং শিখের এই ধ্বনি শুনে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে শবন সিং-এর পালা এল। তাকে যখন অন্য পারে পাঠানের জন্যে অফিসার লেখালেখি করছিলেন তখন সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "টোবা টেকসিং কোথায়? পাকিস্তানে, না হিন্দুস্থানে।" তার প্রশ্ন শুনে অফিসার হেসে বললেন, "পাকিস্তানে।"

অফিসারের উত্তর শুনে শবন সিং ছিটকে সরে গেল। তারপর ছুটতে ছুটতে তার পেছনে যে সব বন্ধুরা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কাছে এসে হাজির হল। পাকিস্তানের সিপাইরা তাকে জোর করে টেনে ওপারে নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু শবন সিং এক পা-ও এগুতে চাইল না। চীৎকার করে বলতে লাগল, "টোবা টেকসিং কোথায়—ও পড় দি গিড়-গিড় দি এক্স দি বে ধ্যানা দি, মংগ দি, দাল দি আও টোবা টেকসিং এ্যান্ড পাকিস্তান।"

তাকে খুব বোঝানো হল, "দ্যাখো, টোবা টেকসিং এখন হিন্দুস্থানে চলে গিয়েছে। যদি এখনও না গিয়ে থাকে তবে খুব তাড়াতাড়ি তাকে পাঠানো হবে।" কিন্তু সে কোন কথাই শুনল না। তাকে জোর করে ওপারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু শবন সিং হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানের মাঝখানে একটি জায়গায় তার সোজা পা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এমনভাবে সে দাঁড়াল যেন কোন শক্তিই তাকে এখান থেকে একচুল সরাতে পারবে না। শবন সিং খুব রুগ্ন ছিল বলে কেউ আর তার ওপর জবরদস্তি করল না। তাকে ঐখানে ঐভাবে ছেড়ে দিয়ে আদান-প্রদানের কাজ চলতে লাগল।

সূর্য ওঠার ঠিক আগে ঐ জায়গায় তেমনি দাঁড়িয়ে শবন সিং হঠাৎ ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠল। দুই দিককার অফিসাররা চীৎকার শুনে তার দিকে ছুটে এল। তারা দেখল, যে মানুষ দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, সে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার পায়ের কাছে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুস্থানের পাগলরা আর মাথার দিকে সার দিয়ে পাকিস্তানের পাগলরা। আর দু' সারির মাঝখানে—যে জায়গার কোন নাম নেই সেখানে পড়ে আছে টোবা টেকসিং।

খোদার কসম

ঐদিক থেকে মুসলমান, আর এদিক থেকে হিন্দুরা এখনও যাওয়া-আসা করছে। প্রতিটি ক্যাম্পই লোকে গাদাগাদি। এমন গাদাগাদি যে, তিল ধারণের আর জায়গা নেই। তা সত্বেও ক্যাম্পগুলোতে ঠুসে ঠুসে লোক ঢুকানো হচ্ছে। খাওয়া দাওয়ার যে ব্যবস্থা তা না বললেও চলে। এই মানুষগুলো যাতে রোগে আক্রান্ত না হয় তারও কোন রকম ব্যবস্থা নেই। রোগ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। এর প্রতি কে নজর দেবে? এক লণ্ডভণ্ড পরিবেশ।

সময়টা উনিশশ' আটচল্লিশের প্রারম্ভ। খুব সম্ভব মার্চ মাস। এদিক ওদিক—দুদিকেই রাজাকারদের দ্বারা 'অপহৃত' মেয়ে আর শিশুদের উদ্ধারের প্রশংসনীয় কাজ শুরু হয়েছে। হাজার হাজার পুরুষ নারী ছোকরা ছুকরি এই পবিত্র কাজে অংশ গ্রহণ করছে। যখন এদের কাজ করতে দেখি, তখন আমি আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠি। ডগমগ হয়ে উঠি তার কারণ, মানুষ স্বয়ং মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার জন্যে চেষ্টা করছে। যাদের সমস্ত কিছু লুণ্ঠিত হয়েছে, তারা যেন আর লুণ্ঠিত না হয় তার জন্যে চেষ্টা করছে—কিন্তু কেন এ চেষ্টা?

এই চেষ্টা কি এজন্যে তো, তাদের আচলে যেন আর কোন দাগ না লাগে? তারা যাতে তাদের রক্তাক্ত আঙুল চেটে নিয়ে আবার দস্তরখানের ওপর পুরুষ মানুষের সঙ্গে বসে রুটি খেতে পারে? অন্যেরা যখন চোখ বন্ধ করে আছে, ঠিক তখনই কি মনুষত্বের সুই-সুতো দিয়ে ছেঁড়া কাপড়ের মতো লুণ্ঠিত ইজ্জতকে রিপু করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মনে হল ঐ রাজাকারদের যে কাজ কারবার, তাকেই যেন সম্মানিত করা হচ্ছে।

তাদের হাজারো রকমের কঠিন থেকে কঠিনতর যে সমস্যা তার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। হাজরো রকমের ঝামেলা পোয়াতে হত, আর তার মোকাবিলাও করতে হত। কারণ যারা মহিলা এবং ছুকরিদের উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারা একই জায়গায় স্থির হয়ে বসে ছিল না। আজ এখানে তো কাল ঐখানে। আজকে এই মহল্লায় আছে, কালকে চলে গিয়েছে আর এক

মহল্লায়। আর আস-পাশের লোকজনও তাদের কোন ভাবে মদদ দিত না।

অদ্ভুত অদ্ভুত সব খবর শুনতে পাওয়া যেত। একজন লিয়াজো অফিসার আমাকে বলেন, সাহরণপুরে দু'জন মেয়ে পাকিস্তানে তার বাপ-মার কাছে ফিরে যেত অস্বীকার করে, আর একজন বললেন, 'জলন্ধরে আমি একজন মেয়েকে জোর জবরদস্তি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সেই পরিবারের সবাই আমাকে বলে মেয়েটি তাদের পরিবারের গৃহবধূ। দূরে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে। কয়েক জন মেয়ে তো বাপ মার হাত থেকে বাঁচার জন্যে পথেই আত্মহত্যা করে। কেউ কেউ বা উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। এমন মেয়েও দেখলাম যাদের মদ গেলা আদতে পরিণত হয়েছে। তেষ্টা পেলে জলের বদলে মদ খায়। আর কুৎসিৎ কুৎসিৎ সব গালি-গালাজ করে।

আমি যখন এই সব মেয়ে আর মহিলাদের কথা ভাবি তখন আমার চোখের সামনে শুধু ভেসে ওঠে উঁচু—ফুলে-ওঠা পেট। এই ফুলে-ওঠা পেটগুলোর পরিণতি কি হবে? এই পেটগুলো যা দিয়ে ভর্তি, তার মালিক কে হবে—পাকিস্তান, না হিন্দুস্তান?

আর এই ন' মাসের যে ভার, সেই ভার কে খালাস করবে,—পাকিস্তান, না হিন্দুস্তান? এই যে অত্যাচার আর দুর্দশা তা কোন্ জমা-খরচের খাতায় লেখা হবে? হয় তো এই জমা-খরচের খাতায় অনেক পৃষ্ঠাই খালি থেকে যাবে।

গর্ভবতী মেয়েরা আসছে—যাচ্ছে।

আমি ভাবছিলাম, এদের কেন ভাগিয়ে নিয়ে-যাওয়া বলা হচ্ছে—এদের কবে অপহরণ করা হয়েছে? অপহরণ তো এক রোমাণ্টিক ব্যাপার, আর যাতে দু'জনেরই মনের আন্তরিক সায় থাকে। এ এমন এক খাদ, যে খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় দু'জনেরই রক্তের তন্ত্রীগুলো ঝনঝন করে বেজে ওঠে। কিন্তু এ কেমন অপহরণ, যে অপহৃতাকে জোর করে ঘরে বন্দী করে রাখতে হয়।

কিন্তু তখন এমন এক জামানা চলছিল, যখন তর্ক-বিতর্ক এবং যুক্তি একেবারে মূল্যহীন। যে সময় প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও মানুষ দরজা জানলা বন্ধ করে ঘুমতো। আমিও ঠিক তেমনি হৃদয় আর মস্তিষ্কের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সেই সময় অবশ্য তা হাট করে খুলে রাখা খুবই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমি কি করতে পারি? আমি কোন

কিছুই ভাবতে পারছিলাম না।

গর্ভবতী মেয়েরা আসছে—যাচ্ছে।

এই তামাম তেজারতি কারবার এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলছিল। সাংবাদিক গল্পকার এবং কবিরা তাদের কলম তুলে ব্যস্ততার সঙ্গে মৃগয়া করে চলেছিল। কিন্তু তখন গল্প আর কবিতায় এমন এক স্রোত বয়ে চলেছিল যে, তা স্বতস্ফূর্ত ভাবেই সৃষ্টি হচ্ছিল। কলমের প্রতিটি পদক্ষেপই যেন টলমল করছিল। তাতে এমন এক সত্যতা নিহিত ছিল যে, সবাই ক্রোধে জ্বলে উঠছিল।

একজন লিয়াজো অফিসারের সঙ্গে আমার দেখা হল। সে আমাকে বলল, তুমি এত গম্ভীর কেন ?

আমি তার প্রশ্নের কোন জবাব দিলাম না।

সে আমাকে একটা গল্প বলল। অপহৃত মেয়েদের খুঁজে বের করার জন্যে আমি চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিলাম। এক শহর থেকে আরেক শহর, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম, তারপর আরেক গ্রাম। এক গলি থেকে আরেক গলি, এক মহল্লা থেকে আরেক মহল্লায় ছুটে বেড়াচ্ছিলাম—খুব সামান্য মণি-মুক্তাই হাতে আসছিল।

আমি মনে মনে বললাম, এ কেমন মণি-মুক্তা······আসল না নকল ?

তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না, কত রকম কষ্টেরই না সম্মুখীন হতে হয়েছে।······যা হোক তোমাকে আমি একটা ঘটনা বলছি······আমি সীমান্তের এ পারে বহুবার এসেছি। আর প্রতিবারই এক বৃদ্ধাকে দেখেছি। বৃদ্ধা মুসলমান। বয়স পঞ্চাশের ওপর। একে আমি প্রথম জলন্ধরে দেখি। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া, মগজ একেবারে খালি। উদাস উদাস চোখ, ধুলো বালিতে মাথার চুল জট পাকানো। পরনে শত ছিন্ন কাপড়। না ওর দেহের প্রতি, না ওর মনের প্রতি কোন খেয়াল ছিল। কিন্তু ওর চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কাকে যেন ও আঁতিপাঁতি খুঁজছে।

আমার বোন আমাকে বলল, মহিলাটি আঘাত সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে গিয়েছে। ওর বাড়ি পাতিয়ালা। ওর একমাত্র মেয়েকে ও খুঁজে পাচ্ছে না। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, মেয়েটিকে খুঁজে বের করার জন্যে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। খুব সম্ভব দাঙ্গার সময় মারা গিয়েছে, কিন্তু বুড়ি কিছুতেই তা মানতে রাজি নয়।

দ্বিতীয়বার আমি এই বৃদ্ধাকে সাহরণপুরে এক লরির আড্ডায় দেখি। এবার তার অবস্থা আগের চেয়ে অনেক খারাপ এবং শরীর আরও ভেঙ্গে গিয়েছে। ওর ঠোঁটের ছাল চামড়া উঠে গিয়েছে। মাথার চুল সাধুদের মতো জট পাকানো। আমি ওর সঙ্গে আলাপ করলাম। চাইলাম, যাতে ও মিথ্যে খোঁজা খুঁজি ছেড়ে দেয়। তাই আমি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে ওকে বললাম, আম্মা তোমার মেয়েকে কোতল করা হয়েছে। পাগলী আমার দিকে ঘুরে তাকাল, কোতল, না হতেই পারে না। ওর কণ্ঠে যেন এক অসীম বিশ্বাস সৃষ্টি হল, না ওকে কেউ মারতে পারে না—আমার মেয়েকে কেউ হত্যা করতে পারবে না।

আর ও চলে গেল মেয়েটির ব্যর্থ খোঁজে। ভাবলাম, তালাশ, খোঁজাখুঁজি তারপর···। কিন্তু এই পাগলীর এমন বিশ্বাস কি করে হল যে, ওর মেয়ের ওপর কেউ কৃপাণ তুলতে পারে না – কেন কোন ধারালো ছোরা বা অন্য কিছু ওর গর্দানের ওপর নামতে পারে না—ও কি অমর—না ওর মমতা অমর? মমতা অবশ্যই অমর। ওকি নিজের মমতা খুঁজে বেড়াচ্ছে—আর সেই মমতাই কি ওকে কোথাও হারিয়ে দিয়েছে···?

তৃতীয়বার কাজের ফেরে ওকে আমি আবার দেখি। এবার সে একেবারে বেহাল হয়ে গিয়েছে। বলা যেত পারে প্রায় উলঙ্গ। আমি ওকে কাপড় দিলাম, কিন্তু ও সে-কাপড় নিল না।

আমি তাকে বললাম, আম্মা, আমি ঝুট বলছি না, তোমার মেয়েকে পাতিয়ালাতেই হত্যা করা হয়েছে।

সে আবার তেমনি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল, তুই মিথ্যে কথা বলছিস।

আমি আমার কথা বিশ্বাস করানোর জন্যে বললাম, না আমি সত্যি বলছি। অনেক কান্না কাটি তুমি করেছ—আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাব।

ও আমার কথা শুনল না। বিড়বিড় করে কি যেন বলে চলল। বিড়বিড় করতে করতে ও ভীষণ চমকে উঠল। আবার তেমনি জোরালো কণ্ঠে বলতে লাগল, না আমার মেয়েকে কেউ হত্যা করতে পারে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

বুড়ি আবেগে বলতে লাগল, ও খুব খুবসুরত—এত খুবসুরত যে,

ওকে কেউই হত্যা করতে পারবে না—এমন কি ওর গালে কেও একটি চড় পর্যন্ত মারতে পারবে না।

ভাবতে লাগলাম, সত্যিই কি ও এত সুন্দরী? প্রত্যেক মার চোখেই তার সন্তান চন্দ্র-সূর্য। সত্যিই হয়তো ও সুন্দরী কিন্তু এই তুফানে এমন কোন্ সৌন্দর্য আছে যা মানুষের লোমশ হাত থেকে বাঁচতে পেরেছে। হয়তো পাগলী এই সব মনে মনে ভেবে নিজেকেই ধোকা দিচ্ছে—পালিয়ে যাওয়ার তো হাজারো পথ আছে—দুঃখ এমন এক চকমিনার যেখান থেকে হাজার হাজার লাখ লাখ পথের জাল বিছিয়ে দেয়া যায়।

সীমান্তের এ পারে আমাকে অনেকবার আসতে হয়েছে। প্রতিবারই সেই পাগলীকে দেখেছি। এখন শুধু ওর দেহের হাড় ক'খানিই রয়ে গিয়েছে। চোখের দৃষ্টি শক্তি কমে গিয়েছে। লেংচে লেংচে চলা ফেরা করে। কিন্তু মেয়েকে খোঁজা-খুঁজি ছেড়ে দেয়নি। খুবই মনোযোগ দিয়ে খুঁজে চলেছে। ওর বিশ্বাস তেমনি আগের মতোই স্থির—নিশ্চল, ওর মেয়ে এখনও জীবিত। কারণ ওর মেয়েকে কেউই হত্যা করতে পারে না।

অনেকেই আমাকে বলল, এই বুড়ির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ভালো হয় একে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে পাগলা গারদে দাও।

আমি ওদের কথা ঠিক মনে করলাম না। কারণ ওর এই মিথ্যে মিথ্যে খুঁজে চলার মধ্যেই ওর জীবনে অবলম্বন নিহিত হয়ে আছে। যে অবলম্বন আমি ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাই না। এক বিশাল পাগলা গারদ, যে পাগলা গারদে ও মাইলের পর মাইল পদচারণা করে পায়ের যেন তৃষ্ণা মিটিয়ে চলেছে, সেখান থেকে ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে ছোট্ট চার দেয়ালের একটি পাগলা গারদে কয়েদ করতে চাই না।

শেষবার ওকে আমি অমৃতসরে দেখি। ওর দুর্দশা দেখে আমার চোখ জলে ভরে ওঠে। আমি ফয়সালা করে ফেলি, ওকে পাকিস্তানেই সঙ্গে করে নিয়ে যাব আর পাগলা গারদে ভর্তি করে দেব।

ফরিদ-চকে দাঁড়িয়ে ও ওর কম জোর চোখ দিয়ে এদিক ওদিক দেখছিল। চকে বহু লোকজন চল-ফেরা করছিল। আমি আমার বোনের সঙ্গে এক দোকানে বসে একটা অপহৃত মেয়ে সম্বন্ধে কথবার্তা বলছিলাম। যে অপহৃত মেয়েটির সম্পর্কে আমি খবর পেয়েছি, বাজার সবুবিনিয়ায় এক হিন্দু বোনের বাড়িতে সে আছে। কথাবার্তা শেষ হয়ে গেলে আমি উঠলাম।

ঠিক করলাম, পাগলীকে কোন রকমের বুঝিয়ে সুজিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে যাব। এমন সময় একজোড়া তরুণ তরুণীকে সে দিক দিয়ে যেতে দেখলাম। মেয়েটির মাথার ওপর সামান্য একটু ঘোমটা টানা। মেয়েটির সঙ্গে একজন শিখ তরুণ। দেখতে বেশ ছিমছাম আর সুন্দর। চোখ-মুখও চটকদার।

পাগলীর সামনে দিয়ে যখন তারা যাচ্ছিল, তাকে দেখে তরুণটি মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল। সে দু'পা পেছনে সরে এসে মেয়েটির হাত চেপে ধরল। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় হকচকিয়ে গিয়ে মেয়েটি তার মাথার ঘোমটা একটু সরিয়ে নিল। ধোলাই করা সাদা ওড়নার ফাঁক দিয়ে আমি তার গোলাপী মুখখানা এক ঝলক দেখলাম। আর যার সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করার মতো শব্দ—কোন পরিভাষা আমার ঠোঁটে জুগবে না।

আমি ওদের খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। শিখ তরুণটি এই সৌন্দর্যের দেবীকে ঐ পাগলীর দিকে ইশারা করে খুব চাপা গলায় বলল, তোমার মা।

তরুণীটি মুহূতের জন্যে ওর দিকে তাকাল। তাকিয়েই ঘোমটা টেনে দিল। টেনে দিয়ে শিখ তরুণটির হাত চেপে ধরে খুব চাপা স্বরে বলল, চলো।

আর তারা দু'জনেই রাস্তা থেকে একটু এদিকে সরে এসে খুব দ্রুত হাঁটতে লাগল। পাগলী তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, পালাচ্ছে—পালাচ্ছে।

ও খুব ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল। আমি ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মা, কি ব্যাপার!

ও থরথর করে কাঁপছিল। কাঁপতে কাঁপতে বলছিল, ওকে দেখেছি……আমি ওকে দেখেছি।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাকে দেখেছ ?

ওর দু'চোখের গভীরে জল টলমল করছিল। বলল, আমার মেয়েকে……যে পালিয়ে গিয়েছে, তাকে।

আমি ওকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস দেওয়ার জন্যে বললাম, আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, ও মরে গেছে।

আমার কথা শুনতেই, পাগলী চকের ওপর পড়ে মারা গেল।

কেউ কেউ শুধু জিতেই আনন্দ পায়, কিন্তু ও জিতে আবার তা হেরে গিয়ে খুশী হয়।।

জিততে ওর খুব মুশকিল হয় না, কিন্তু হারতে কয়েকবার ওকে খুব মুশকিলে পড়তে হয়। প্রথমে ও ব্যাঙ্কে চাকরি করত, কিন্তু যখন বুঝল যে ওর অগাধ ধন-দৌলত দরকার তখন ওর বন্ধু আর আত্মীয়-স্বজনরা ওর এই খেয়ালকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু ও একদিন ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে বোম্বাই চলে গেল এবং খুব অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে লাগল।

বোম্বাইতে পয়সা উপার্জনের বেশ কয়েকটা পথ ওর কাছে খোলা ছিল, কিন্তু ও ফিল্মের দুনিয়াকেই ঠিক করে নিল। এতে পয়সা ছিল, ইজ্জতও ছিল। এই দুনিয়াতে বিচরণ করে ও দু'হাতে পয়সা লুটতে পারে এবং উড়াতেও পারে। তাই ও এই জায়গাতেই খেলতে শুরু করল।

লাখ-লাখ টাকা নয়, কোটি-কোটি টাকা ও উপার্জন করে উড়িয়ে দিল। উপার্জন করতে ওর যে সময় লেগেছিল উড়িয়ে দিতে তা লাগেনি। ফিল্মের জন্যে একটি গান লিখল। লিখে লাখ টাকা পেয়ে গেল। কিন্তু এই এক লাখ টাকা বেশ্যাখানায়, বাইজির মহ্‌ফিলে, ঘোড়-দৌড়ের মাঠে এবং জুয়ার আড্ডায় উড়িয়ে দিতে ওর বেশ কিছু দিন লাগল।

ও একটি ফিল্ম তৈরি করল। তাতে দশ লাখ টাকা লাভ হল। এই টাকা কিভাবে উড়ানো যায় ওর কাছে তা এক সমস্যা হিসেবে দেখা দিল। তাই প্রতিটি পদক্ষেপে পদস্খলনের ব্যবস্থা ও তৈরি করে নিল। ও তিনটি গাড়ি কিনল—একটা নতুন, আর দুটো পুরনো। এই পুরনো গাড়ি দুটি যে অকেজো তা ও ভালোভাবেই জানত। এই গাড়ি দুটো ও বাড়ির বাইরে ফেলে রাখল যাতে ভেঙে চুরে নষ্ট হয়ে যায়। আর যেটা নতুন সেটা গ্যারেজে বন্ধ করে রাখল—ভাবটা যেন পেট্রোলের অভাবে চালাতে পারছে না। ট্যাক্সিই ওর কাছে ঠিক ছিল। ভোরে ট্যাক্সি নিত, মাইল খানেক যাওয়ার পর ট্যাক্সি থামাত। থামিয়ে কোন জুয়ার আড্ডায় ঢুকে পড়ত। দু-আড়াই হাজার টাকা হেরে পরদিন আড্ডা থেকে বাইরে বের হত। ট্যাক্সি

বাইরে তেমনিই দাঁড়িয়ে রইত। ট্যাক্সিতে চড়ে বাড়ি যেত এবং ইচ্ছা করেই ট্যাক্সির ভাড়া দিতে ভুলে যেত। সন্ধ্যায় আবার বের হত, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলত, আরে বন্ধু, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ। অফিসে চল, তোমাকে ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি…অফিসে পেঁছে ও আবার ভাড়া দিতে ভুলে যেত। আর…

একটার পর একটা ওর ফিল্ম হিট হল। সাফল্যের যত রেকর্ড ছিল সব ওর কাছে ম্লান হয়ে গেল। টাকার পাহাড় জমে উঠল। সম্মান ও মর্যাদা আকাশকে স্পর্শ করল। ক্ষেপে গিয়ে ও আরও দু তিনটি ফিল্ম তৈরি করল, কিন্তু সেই ফিল্মগুলি হিট না করায় অসাফল্যের এক উদাহরণ হয়ে দাঁড়াল। ওর এই অসাফল্য অন্যকে পথে বসাল। কিন্তু ও আবার সঙ্গে সঙ্গে আস্তিন গুটিয়ে নিল। যারা পথে বসেছিল তাদের ও ভরসা দিল, আর ও এমন ফিল্ম তৈরি করল, মনে হল তা যেন সোনার খনি।

নারী সম্পর্কিত ব্যাপারেও ওর হার-জিত এমনই চক্রাকারে চলত। কোন মহফিল বা কোন বেশ্যালয় থেকে একটি মেয়েকে তুলে আনল, তারপর তাকে সম্মানের উঁচু আসনে বসিয়ে দিল। এবং তার নারীত্বের সমস্ত সৌন্দর্য ম্লান হওয়ার পর ও তাকে এমন সুযোগ করে দিত যাতে ও অন্য কারো গলায় ঝুলে পড়ে।

বড় বড় পুঁজিপতি এবং সুন্দরী প্রেমিকাদের সঙ্গে ওকে মুখোমুখি হতে হত। ও এক হাত বাজি লড়ে যেত। রাজনীতির চাল চলত। এই কাঁটা-গুল্মে হাত দিয়ে ও নিজের পছন্দ মতো ফুল তুলে নিয়ে আসত। এবং পরদিনই নিজের কোটে লাগিয়ে কোন উদার মানুষকে সুযোগ দিত যেন সে এক ঝটকায় ফুলটা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এই সময় ফারস্ রোডের এক জুয়ার আড্ডায় লাগাতার দশ দিন ধরে যাওয়া-আসা শুরু করল—হেরে যাওয়া ওর ওপর জাঁকিয়ে বসেছিল। ও সবে খুব সুন্দরী আর সতেজ এক একট্রেসকে হারিয়েছে এবং এক ফিল্ম তৈরি করে দশ লাখ টাকা বরবাদ করে দিয়েছে। কিন্তু এই দুটি দুর্ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও ওর কোন আক্কেল হয়নি। এ দুটি জিনিসই অপ্রত্যাশিত ভাবে ওর হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ওর ধারণা যে ভুল তা এবার প্রমাণিত হল। তাই এবার ফারস্ রোডের জুয়ার অড্ডায় কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব করে এক বিশেষ অঙ্ক পর্যন্ত ও হারতে লাগল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় পকেটে দু'শ টাকা নিয়ে ও পবন পুলের দিকে চলে যেত। ওর ট্যাক্সি হাট করে খোলা ঘরের জানালাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলত এবং বেশ কিছু দূরে যাওয়ার পর এক ইলেকট্রিক পোস্টের কাছে এসে থেমে যেত। ও ট্যাক্সি থেকে নামত। নেমে তার পুরু কাঁচের চশমাটাকে একবার চোখের ওপর ঠিক ভাবে বাসিয়ে নিত। তারপর ধুতির কোঁচা ঠিক করে একবার ডান দিকে—যেখানে লোহার শিকের ওধারে যে কুৎসিত মেয়ে মানুষটি ভাঙ্গা আয়না নিয়ে নিজের সাজ-গোজে ব্যস্ত থাকত সেদিকে তাকাত। তারপর তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে দোতালার আড্ডায় উঠে যেত।

দশ দিন ধরে ও লাগাতার ফারস্ রোডের এই জুয়াখানায় দু'শ টাকা করে হারার জন্যে আসছে। কখনও কখনও দু-এক হাত খেলার পরই ওর এই দু'শ টাকা খতম হয়ে যেত, আবার কখনও হারতে হারতে ভোর হয়ে যেত।

এগারো দিনের দিনে যখন ওর ট্যাক্সি ইলেকট্রিক পোস্টের কাছে এসে দাঁড়াল তখন ও ওর পুরু কাঁচের চশমাটা এবং ধুতির কোঁচা ঠিক করে নিয়ে এক নজর বাঁয়ে তাকাল। হঠাৎ ওর মনে হল গত দশ দিন ধরে ও এই কুৎসিত মেয়েমানুষটিকে দেখে আসছে। এই মেয়েমানুষটি প্রতিদিনের মতো আজকেও ভাঙা আয়না সামনে নিয়ে একটি কাঠের ওপর বসে সাজ-গোজে ব্যস্ত ছিল।

জানলার কাছে এগিয়ে এসে ও এই আধ বয়সী মেয়ে মানুষটিকে খুব মনযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। দেখল তার গায়ের রঙ মিশ কালো কিন্তু চটকদার, থুতনির ওপর ছোট ছোট নীল রঙের সুই দিয়ে বিন্দি আঁকা। যে বিন্দিগুলো তার গায়ের চামড়ার রঙের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। তার দাঁতগুলোও কেমন বেঢপের। পান আর তামাকের ছোপ-ছোপ দাগ। ওর অবাক লাগল এই মেয়েমানুষটির কাছে কে আসে।

ও জানালার আরও কাছে এগিয়ে গেলে সেই কুৎসিত মেয়েমানুষটি একটু মুচকি হাসল। আয়না একদিকে সরিয়ে রেখে সে খিস্তি দিয়ে বলল, "কি সেঠ থাকবে?"

ও আরও ভালোভাবে সেই মেয়েমানুষটির দিকে তাকাল। এই বয়সেও সেই মেয়ে মানুষটির আশা ছিল তার খদ্দের আছে। ও খুব আশ্চর্য হল। তাই ও তাকে জিজ্ঞেস করল, "বাঈ তোমার বয়স কত?"

প্রশ্ন শুনে মেয়ে মানুষটির বুক ধড়াস করে উঠল। মুখ কুচকিয়ে সে মারাঠী ভাষায় এক গালি দিল। ও নিজের ভুল বুঝতে পারল। বুকে বেশ লজ্জার সঙ্গে বলল, "বাঈ, আমাকে মাফ কর। আমি এমনিই তোমাকে এ প্রশ্ন করেছিলাম। তুমি প্রতিদিন সাজ-গোজ করে বসে থাক বলে আমার খুব আশ্চর্য লাগে। তোমার কাছে কেউ আসে ?"

মেয়ে মানুষটি এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। ও আবার নিজের ভুল বুঝতে পারল এবং অত্যন্ত সরলতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি বাঈ ?"

মেয়ে মানুষটি পর্দা সরিয়ে ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে ছিল, কিন্তু ওর প্রশ্ন শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, "গঙ্গু বাঈ।"

"গঙ্গু বাঈ, তুমি প্রতিদিন কত কামাও ?"

ওর কণ্ঠে সহানুভূতি এবং দরদ ছিল। গঙ্গু বাঈ জানালার শিকের কাছে এগিয়ে এসে বলল, "ছ-সাত টাকা, কোন কোন দিন কিছুই কামাতে পারি না।"

—"ছ-সাত টাকা, আর কোন কোন দিন কিছুই কমাতে পারি না' গঙ্গু বাঈ-এর কথাগুলি আওড়াতে আওড়াতে ওর দু'শ টাকার কথা মনে হল। যে দু'শ টাকা ওর পকেটে ছিল এবং যা হারার জন্যে ও সঙ্গে করে এনেছিল। হঠাৎই ওর মনে এক ইচ্ছা জেগে উঠল। ও গঙ্গু বাঈকে বলল,"দেখ গঙ্গু বাঈ, তুমি তো প্রতিদিন ছ-সাত টাকা কামাও—তুমি আমার কাছ থেকে দশ টাকা করে নিও।"

—"কেন থাকার জন্যে ?"

—"না,···মনে কর আমি থাকার জন্যেই তোমাকে এই টাকা দিচ্ছি।" গঙ্গু বাঈকে এই কথা বলে ও পকেটে হাত ঢোকাল এবং দশ টাকার একটা নোট বের করে শিকের ফাঁক দিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এই নাও।"

গঙ্গু বাঈ নোটটা নিল। কিন্তু সে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

ও বলল, "গঙ্গু বাঈ, আমি তোমাকে প্রতিদিন এই সময় দশ টাকা করে দিয়ে যাব। কিন্তু একটা শর্ত আছে।"

—"শর্ত ?"

—"শর্ত হচ্ছে, দশ টাকা নেয়ার পর তুমি খাবার টাবার খেয়ে ঘরে শুয়ে থাকবে…রাত্রে যেন তোমার ঘরে বাতি জ্বলতে না দেখি।"

গঙ্গু বাঈ-এর ঠোঁটে এক অদ্ভুত দুঃখের হাসি খেলে গেল।

—"হাসির কথা নয়, আমি আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।"

এই কথা বলে ও ওপরে জুয়ার আড্ডায় চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ও ভাবল, এই টাকাতো আমি হারার জন্যেই নিয়ে এসেছি। দু'শ টাকা নয়, একশ নব্বুই টাকা হারব।

কয়েকটি দিন এমনি ভাবে চলে গেল। প্রতিদিন ওর ট্যাক্সি ঠিক সন্ধ্যার সময় ইলেকট্রিক পোস্টের কাছে এসে থামত। দরজা খুলে ও বাইরে বেরিয়ে আসত। এবং পুরু কাঁচের চশমা দিয়ে ডান দিকে গঙ্গু বাঈ-এর দিকে তাকাত। দেখত গঙ্গু বাঈ জানলার ধারে চৌকির ওপর বসে আছে। নিজের ধুতির কোঁচা ঠিক করতে করতে ও জানলার কাছে এগিয়ে যেত এবং গঙ্গু বাঈ-এর দিকে দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিত। গঙ্গু বাঈ নোটটা মাথায় ঠেকিয়ে কুর্নিশ করত। আর ও একশ' নব্বুই টাকা হারার জন্যে দোতলায় উঠে যেত। এর মধ্যে দু-তিন বার জুয়ায় হেরে রাত্রি এগারোটা-বারোটা বা দুটো-তিনটার সময় ও নীচে এসে দেখেছে গঙ্গু বাঈ-এর ঘর বন্ধ।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও দশ টাকা দিয়ে দোতলায় গেল। কিন্তু দশটা বাজতে না বাজতেই ওর ছুটি হয়ে গেল। সেদিন তাসের পাতা এমন পড়ল যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওর একশ' নব্বুই টাকা হাওয়া হয়ে গেল। দোতলা থেকে নেমে ও যখন ট্যাক্সিতে বসতে গেল তখন গঙ্গু বাঈ-এর ঘরের দরজা খোলা। আর সে জানালার ধারে চৌকির ওপর বসে খদ্দেরের জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ও গঙ্গু বাঈ-এর ঘরের দিকে এগুলো। ওকে দেখে গঙ্গু বাঈ ঘাবড়িয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে ও জানালার ধারে পেঁৗছে গিয়েছিল।

—"গঙ্গু বাঈ, একি ব্যাপার ?"

গঙ্গু বাঈ ওর প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

—"খুব আফসোসের কথা, তুমি তোমার কথা রাখনি।…আমি তোমাকে বলেছিলাম, রাত্রে যেন তোমার ঘরে বাতি জ্বলতে না দেখি।

কিন্তু তুমি এখানে এইভাবে বসে আছ।"

ওর কণ্ঠে দুঃখ ছিল। গঙ্গু বাঈ চিন্তায় পড়ে গেল।

—"তুমি খুব খারাপ"—বলে ও যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

গঙ্গু বাঈ বলল, "সেঠজী, দাঁড়াও।"

ও দাঁড়িয়ে পড়ল। গঙ্গু বাঈ ধীরে ধীরে, এক একটি শব্দ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "হ্যা, আমি খুব খারাপ। কিন্তু এখানে সাচ্চা কে!··· সেঠজী তুমি দশ টাকা দিয়ে একটি বাতি নিভিয়েছ।···একটু তাকিয়ে দেখতো কত বাতি জ্বলছে।"

ও একদিকে সরে দাঁড়াল এবং সার সার ঘর গুলোর ওপর জানালায় চোখ বুলাল। একটি নয়, অসংখ্য সার সার বাতি রাত্রির ধূসর পরিবেশে টিম টিম করে জ্বলছে। "তুমি কি এই সমস্ত বাতি নেভাতে পারবে?"

ও ওর চশমার পুরু কাঁচের মধ্যে দিয়ে গঙ্গু বাঈ-এর মাথার ওপর লটকানো বাল্ব-এর দিকে তাকাল। তারপর গঙ্গু বাঈ-এর ধূসর শরীরের দিকে ওর ঘাড় হেঁট করে বলল, "না, পারব না গঙ্গু বাঈ, পারব না।"

ও যখন ট্যাক্সিতে উঠে বসল, তখন ও অনুভব করল ওর পকেটের মতো ওর হৃদয়ও শূন্য—খালি।

অব্বু কোচোয়ান ছিল খুবই সুপুরুষ। তার টাঙ্গার ঘোড়াও ছিল শহরের এক নম্বর ঘোড়া। যে-সে সওয়ারি সে কখনও নিত না। বাঁধা খদ্দের ছিল। এই বাঁধা-ধরা খদ্দেরদের কাছ থেকে দিনে দশ-পনেরো টাকা পেলেই অব্বুর কাছে যথেষ্ট ছিল। অন্যান্য কোচোয়ানদের মতো নেশা-ভাঙ সে করত না। সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরে সেজে-গুজে থাকা সে খুব পছন্দ করত।

তার টাঙ্গা যখন ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে রাস্তা দিয়ে চলে যেত তখন আপনা-আপনি সবার চোখ তার টাঙ্গার ওপর গিয়ে পড়ত। "ঐ-যে ফুলবাবু অব্বু যাচ্ছে। দেখ কেমন ডাঁট নিয়ে বসে আছে। পাগড়িটা দেখ, কেমন তেরচা করে বেঁধেছে!"

লোকের চোখের এই ভাষা যখন অব্বু শুনত তখন তার ঘাড় এক অভিজাত্য বোধে ফুলে উঠত এবং তার ঘোড়ার চাল আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। ঘোড়ার লাগাম অব্বুর হাতে এমন কায়দায় ধরা থাকত, যেন তা ধরার কোন প্রয়োজনই নেই। মনে হত, ঘোড়া যেন বিনা-ইশারায় চলেছে। তার মালিকের হুকুমের কোন প্রয়োজন নেই। কখনও কখনও এমন মনে হত, অব্বু আর তার ঘোড়া চুন্নী যেন অভিন্ন। যেন পুরো টাঙ্গাটাই একটি জীবন। আর এই জীবন অব্বু ছাড়া আর কে হতে পারে।

যে সব সওয়ারিদের অব্বু নিতে অস্বীকার করত তারা মনে মনে অব্বুকে গাল দিত। কেউ কেউ আবার অভিশাপও দিত,—"ভগবান যেন এর অহংকার নষ্ট হয়, টাঙ্গা-ঘোড়া যেন নদীতে পড়ে।"

অব্বুর ঠোঁটের ওপর যে হাল্কা-হাল্কা গোঁফের রেখা ছিল, তাতে আত্মবিশ্বাসের এক মিষ্টিহাসি লেগে থাকত। তাকে দেখে কোন কোন কোচোয়ান জ্বলে-পুড়ে মরত। অব্বুর দেখাদেখি কয়েকজন কোচোয়ান এদিক-সেদিক থেকে ধার-দেনা করে টাঙ্গা বানাল। টাঙ্গাকে পিতলের সাজ দিয়ে সাজাল। কিন্তু তবু তাদের টাঙ্গা অব্বুর সাজ-বাটের কাছে দাঁড়াতে পারল না। তাদের টাঙ্গা-ঘোড়ার চেয়ে অব্বুর টাঙ্গা-ঘোড়াকে লোকে বেশী পছন্দ করত।

একদিন দুপুরে অব্বু এক গাছের ছায়ায় তার ঘোড়াকে বেঁধে টাঙ্গার ওপর বসে একটু ঝিমুচ্ছিল এমন সময় একটি শব্দ তার কানের কাছে গুন গুন করে উঠল। অব্বু চোখ মেলে তাকাল। দেখল একজন মহিলা টাঙ্গার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অব্বু এক ঝলক তাকে দেখে নিল। সেই মহিলার উচ্চারিত যৌবন তার হৃদয়কে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। সে মহিলা ছিল না, ছিল ষোল সতেরো বৎসরের তরুণী। ছিপছিপে কিন্তু সুগঠন। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কানে রুপোর ছোট ছোট দুল। সোজা সিঁথি। তীক্ষ্ম নাক। আর নাকের ডগায় উজ্জ্বল তিল। পরনে লম্বা কামিজ আর নীল রঙের গারারা। মাথায় ওড়ানা।

মেয়েটি তারুণ্যের কণ্ঠে অব্বুকে জিজ্ঞেস করল, "এ্যাই স্টেশন যেতে কত নেবে?"

অব্বুর ঠোঁটের মুচকি হাসি এক নিমেষে দুষ্টুমির হাসিতে পাল্টে গেল। বলল, "কিচ্ছু লাগবে না।"

মেয়েটির শ্যামবর্ণ মুখের ওপর লালিমা ছেয়ে গেল,—"কত নেবে স্টেশন যেতে?"

অব্বুর চোখ দিয়ে তাকে অবগাহন করতে করতে বলল, "তোর কাছ থেকে আমি কি নেব রে! চলে আয়—টাঙ্গাতে বস।"

মেয়েটি সন্ত্রস্ত হয়ে তার হাত দুটি নিজের সুডৌল বুকের ওপর রেখে যতটুকু সম্ভব ঢাকার চেষ্টা করল। 'তুমি কেমন ধরনের কথা বল?"

অব্বু হেসে বলল, "আয়, উঠে বস। তুই যা দিবি তাই নিয়ে নেব।"

মেয়েটি একটু চিন্তা করল। তারপর পাদানিতে পা দিয়ে টাঙ্গাতে উঠে বসল। বসে বলল, "জলদি স্টেশনে নিয়ে চল।"

অব্বু পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, "তোর খুব জলদি আছে, তাই না!"

—"হায়, হায়, তু···"মেয়েটি আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

টাঙ্গা ছুটতে লাগল···ছুটতেই লাগল। ঘোড়ার খুরের নীচ দিয়ে কয়েকটি রাস্তা ছুটে পার হয়ে গেল। মেয়েটি লজ্জায় জড়-সড় হয়ে বসে রইল। অব্বুর ঠোঁটে দুষ্টু দুষ্টু হাসি ঝিলিক দিচ্ছিল। বেশ দেরী হয়ে যাচ্ছিল বলে মেয়েটি ভয়ার্ত কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করল, "এখনও স্টেশন আসেনি?"

অব্বু বেপরোয়া ভাবে উত্তর দিল, "এসে যাবে। তোর আমার স্টেশন তো একই।"

—"মানে ?"

অম্বু পেছন ফিরে মেয়েটির তাকিয়ে বলল, "কি এতটুকু বুঝিস না, তোর-আমার স্টেশন একই ? অম্বু যখন তোকে দেখেছে তখনই এক হয়ে গিয়েছে। তোর জানের কসম, তোর গোলাম ঝুট বলছে না।"

মেয়েটি তার মাথার ওড়না টেনে দিল। ওর চোখই ওকে বলে দিচ্ছিল অম্বু কী বলতে চায় তা ও বুঝে ফেলেছে। আর তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল অম্বুর কথায় সে একটুও ক্ষুন্ন হয়নি। কিন্তু তার দ্বিধা ছিল দু'জনের স্টেশন এক হোক আর না হোক অম্বু তো সুন্দর। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হবে তো! স্টেশনে গিয়ে আর কি হবে, তার গাড়ি কখন চলে গিয়েছে কে জানে ?

অম্বুর প্রশ্নে সে চমকে উঠল, "কি এতো ভাবছিস ?"

ঘোড়া বেশ মেজাজে দুলকি চালে চলছিল। ভিজে-ভিজে একটা হাওয়া বইছিল। রাস্তার দু'ধারের গাছগুলি ছুটে ছুটে চলে যাচ্ছিল। আর তার ডালগুলি ঝুঁকে ছিল। ঘুঙুরের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না। অম্বু ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটির শ্যামবর্ণ সৌন্দর্যকে নিজের হৃদয়ে গেঁথে নিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর সে জানালার একটি শিকের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে একলাফে পেছনের সিটে মেয়েটির পাশে গিয়ে বসল। ও চুপচাপ বসে ছিল। অম্বু ওর হাত দুটি ধরে বলল, "দে তোর লাগাম আমার হাতে দে।"

মেয়েটি শুধু বলল, "ছেড়ে দে"। কিন্তু তার আগেই সে অম্বুর বাহুপাশে আবদ্ধ হল। সে কোন আপত্তি করল না। নিশ্চয়ই সেই সময় তার হৃদয়ে খুব তোলপাড় চলছিল। যেন নিজেকে ছেড়ে তা উড়ে যেতে চাইছিল।

অম্বু ধীরে ধীরে তার ভালোবাসার কণ্ঠে তাকে বলতে লাগল, "এই টাঙ্গা এই ঘোড়া আমার জীবনের থেকেও প্রিয়। আমি একাদশ পীরের কসম খেয়ে বলছি, এই টাঙ্গা-ঘোড়া আমি বেচে তোর জন্যে সোনার বালা গড়ে দেব। নিজে ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরব, কিন্তু তোকে রাজকুমারী সাজিয়ে রাখব। ওয়াদহু লা-শরিকের কসম খেয়ে বলছি জীবনে এই আমার প্রথম প্রেম। তুই যদি আমার না হোস তবে তোর সামনেই আমার গলা কেটে ফেলব।"

তারপর সে মেয়েটিকে নিজের বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে দিল। বলল, "জানি না আমার কি হয়ে গিয়েছিল, চল, তোকে স্টেশনে ছেড়ে আসি।"

মেয়েটি ধীরে বলল, "না, তা-আর হয় না। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়েছ।"

অব্বুর মাথা ঝুঁকে গেল, "আমাকে মাফ করে দে—ভুল হয়ে গিয়েছে।"

—"ভুলটাকে কি শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিতে পারবে ?"

মেয়েটির কণ্ঠে চ্যালেঞ্জ ছিল। যেন কেউ অব্বুকে বলল, "এই টাঙ্গা থেকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও নিজের টাঙ্গা।" অব্বুর হেঁট মাথা সোজা হয়ে গেল। তার চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

অব্বুর তার বলিষ্ঠ বুকের ওপর হাত রেখে বলল, "অব্বু তোর জন্যে নিজের জান দিয়ে দেবে।"

মেয়েটি তার হাত অব্বুর দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বলল, "এই নে আমার হাত।"

অব্বু তার হাত দৃঢ়তার সঙ্গে চেপে ধরে বলল, "কসম আমার যৌবনকে, অব্বু তোর গোলাম।"

পরের দিন অব্বু আর সেই মেয়েটির নিকা হয়ে গেল। মেয়েটি গুজরাটের কোন এক জেলার মুচির মেয়ে। তার নাম ইনায়ত বা নীতি। নিজের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে ও এখানে এসেছিল। স্টেশনে ওরা যখন প্রতীক্ষা করছিল তখন অব্বুর সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হয়। আর সেই সাক্ষাৎই সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসার মহল গড়ে তুলল। অব্বু টাঙ্গা-ঘোড়া বেচে দিয়ে যদিও নীতির জন্যে কোন সোনার বালা গড়ে দেয়নি, কিন্তু তার জমানো টাকা দিয়ে সে তার জন্যে সোনার দুল কিনেছিল। রেশমের কয়েকটি জামা-কাপড়ও তৈরী করেছিল।

রেশমী জামা-কাপড় পড়ে সে যখন অব্বুর সামনে এসে দাঁড়াত তখন তার হৃদয় নেচে উঠত—"কসম পবিত্র পঞ্জতনের নামে, দুনিয়াতে আমার চেয়ে খুশীতে পাগল মানুষ আর দুটি নেই।" নীতিকে সে তার বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলত, "তুই আমার দিল কী রাণী।"

দু'জনেই যৌবনের পাগলপনায় ডুবে ছিল। গাইত হাসত ঘুরে বেড়াত আর দু'জন দু'জনের শুভ কামনা করত। এক মাস এমনি ভাবে কেটে গেল। কিন্তু একদিন হঠাৎ পুলিশ এসে অব্বুকে গ্রেফতার করল। নীতিকেও

ধরে নিয়ে গেল। অব্বুর ওপর অপহরণের মামলা চলল। নীতি একটুও টলল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অব্বুর দু'বৎসরের কারাদণ্ড হল। আদালত যখন এই ফরমান দিল, তখন নীতি অব্বুকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে কাঁদতে ও শুধু বলল, "আমি আমার মা-বাবার কাছে যাব না—ঘরে বসে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।"

অব্বু তার পিঠে টোকা মেরে বলল, "বেঁচে থাক,...টাঙ্গা-ঘোড়া আমি দীনার জিম্মায় রেখে গেলাম...ভাড়া উশুল করে নিস।"

নীতির বাবা-মা ওকে অনেক বোঝাল, কিন্তু ও কিছুতেই তাদের সঙ্গে গেল না। ক্লান্ত হয়ে অবশেষে তারা হাল ছেড়ে দিল। নীতি একাই থাকতে লাগল। সন্ধ্যার সময় দীনা ওকে পাঁচ টাকা করে দিয়ে যাচ্ছিল। এই পাঁচ টাকা ওর খরচ-খরচার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর তাছাড়া মোকদ্দমার জন্যে প্রতিদিন পাঁচ টাকা থেকে যা খরচ করে বাঁচত তাও ওর কাছেই ছিল।

সপ্তাহে একবার জেলখানায় নীতি আর অব্বুর দেখা-সাক্ষাৎ হত। আর এইসময়টুকু ছিল ওদের কাছে খুবই সংক্ষিপ্ত। নীতির কাছে যতটুকু জমা টাকা ছিল তা অব্বুর আরামের জন্যে খরচ হয়ে গেল। এক সাক্ষাতে অব্বু নীতির খালি কানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "নীতি তোর কানের দুল কোথায়?"

নীতি হেসে দিল। হেসে শান্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে অব্বুকে বলল, "চুপ হয়ে গেলে কেন?"

অব্বু বেশ কিছুটা রুষ্ট হয়ে বলল, "আমার কথা তোকে এত ভাবতে হবে না। যে ভাবেই থাকি না কেন, ভালোই আছি।"

নীতি কোন জবাব দিল না। সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই হাসতে হাসতে সে ওখান থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু বাড়িতে এসে খুব কাঁদল। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল, কারণ অব্বুর শরীর একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। এবারের সাক্ষাতে অব্বুকে প্রায় চিনতেই পারছিল না। দোহারা-চেহারার অব্বু ভেঙ্গে ভেঙ্গে অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। নীতির মনে হচ্ছিল অব্বুকে অব্বুর দুঃখ কুরে কুরে খাচ্ছে। তার বিচ্ছেদেই অব্বুকে এমন করে দিয়েছে। কিন্তু সে জানত না অব্বুকে ক্ষয়রোগে ধরেছে। এ অসুখ সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। অব্বুর বাবা অব্বুর চেয়ে বলিষ্ঠ

ছিল, কিন্তু ক্ষয়রোগ তাকেও অল্পদিনের মধ্যে কবরে নিয়ে গিয়েছিল। অব্বুর বড় ভাইও সুন্দর জোয়ান ছিল। কিন্তু পরিপূর্ণ যৌবনে এই অসুখ তাকেও পিষে মারে। অব্বু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। তাই জেলের হাসপাতালে সে যখন শেষ নিশ্বাস নিচ্ছিল, তখন দুঃখে সে বলল, "ওয়াদহু লা-শরীকের কসম খেয়ে বলছি, যদি জানতাম এত তাড়াতাড়ি মারা যাব তবে তোকে কখনও বিবি করতাম না……আমি তোর ওপর অনেক জুলুম করেছি…আমাকে মাফ করে দে…আর আমার এক নিশানা আছে —আমার টাঙ্গা-ঘোড়া....একটু নজর দিস…আর চুন্নী বেটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলিস, অব্বু তোকে ভালোবাসা পাঠিয়েছে।"

অব্বু মারা গেল—আর নীতিরও সব কিছু মারা গেল। কিন্তু ও ছিল সাহসী মহিলা। এই দুঃখকে ও সহ্য করে নিল। ঘরে একা একা পড়ে থাকত। সন্ধ্যার সময় দীনা আসত। এসে তাকে ভরসা দিয়ে বলত, "কোন কিছু ভেব না ভাবী, খোদার ওপরে কারও হাত নেই। অব্বু আমার ভাই ছিল…আমার পক্ষে যা করা সম্ভব, খোদার হুকুমে আমি তা করব।"

প্রথম প্রথম নীতি কিছুই বুঝতে পারত না। কিন্তু যখন শোকের দিন পুরো হল, তখন দীনা খোলাখুলি তাকে বিয়ে করতে বলল। দীনার কথা শুনেই নীতির মনে হল ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘরের বাইরে বের করে দেয়। দীনাকে শুধু সে বলল, "ভাই, আমি বিয়ে করব না।"

সেইদিন থেকে দীনার ব্যবহারও পালটে গেল। আগে প্রতি দিনই সন্ধ্যায় পাঁচ টাকা আদায় হত। এখন কোন দিন চার টাকা কোন দিন তিন টাকা করে দিতে লাগল। বাহানা দিতে লাগল খুব মন্দা চলছে। আবার কখনও কখনও দু-দু তিন-তিন দিন বেপাত্তা হয়ে থাকতে লাগল। কখনও বলত অসুখ করেছে, কখনও বাহানা দিত গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছে সেজন্যে ঘোড়া জুততে পারিনি। ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারল, তখন সে দীনাকে বলল, "ভাই দীনা, তোমার আর হয়রান হওয়ার প্রয়োজন নেই। টাঙ্গা-ঘোড়া আমাকে জমা দিয়ে যাও।"

অনেক টালবাহানার পর মুখ কাচুমাচু করে সে টাঙ্গা এবং ঘোড়া নীতিকে ফেরত দিল। যাওয়ার সময় দীনা মাঝেকে দিয়ে গেল। মাঝে ছিল অব্বুর বন্ধু। সেও কয়েকদিন পরে নীতির কাছে বিয়ের প্রার্থনা করল।

নীতি অস্বীকার করলে তার চোখের ভাষাও পালটে গেল। সহানুভূতিটুতি সব উবে গেল। তার কাছ থেকেও নীতি টাঙ্গা-ঘোড়া ফেরত নিয়ে নিল এবং এক অচেনা কোচোয়ানকে দিল।

এক সন্ধ্যায় সে যখন পয়সা দিতে এল তখন সে নেশায় বুঁদ ছিল। দরজায় পা দিয়েই সে নীতির গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করল। নীতি তাকে খুব একচোট নিল এবং কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিল।

আট দশ দিন টাঙ্গা-ঘোড়া এমনিই আস্তাবলে পড়ে রইল। ঘাস এবং দানার খরচ ছাড়াও আস্তাবলের ভাড়া ছিল। নীতি এক অদ্ভুত চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিল। কেউ বিয়ের প্রার্থনা করে, কেউ তার অসম্মতির ওপর হাত লাগানোর চেষ্টা করে, কেউ পয়সা মেরে দেয়। বাইরে বের হলে মানুষ খারাপ নজরে ঘুরে ঘুরে দেখে। এক রাতে তার এক প্রতিবেশী দেয়াল টপকে তার ঘরে এল এবং তার গায়ে হাত দিল। ভাবতে ভাবতে নীতির পাগল হয়ে যাবার উপক্রম, এখন সে কি করে।

একদিন বসে ভাবতে ভাবতে তার মাথায় এল, আমি কেন নিজেই টাঙ্গা জুতি না—নিজেই চালাই। যখন সে অব্বুর সঙ্গে বেড়াতে বের হত তখন তো সে নিজেই টাঙ্গা চালাত। শহরের রাস্তা-ঘাটও তো জানা। কিন্তু সে আবার ভাবল, লোকে কি বলবে? তার মন এবং চেতনাই তাকে উত্তর জোগাল—এতে কি আছে, মেয়েরা মেহনত করে রোজগার করে—কয়লার খনিতে কাজ করে, অফিসে-দপ্তরে কাজ করে, ঘরে বসেও কাজ করার মেয়েতো হাজার হাজার আছে। যেমন করেই হোক পেট চালাতে হবে।

কয়েকদিন ধরে নীতি চিন্তা-ভাবনা করল। শেষে সে ঠিক করল, টাঙ্গা সে নিজেই চালাবে। নিজের ওপর তার পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল। সুতরাং খোদার নাম নিয়ে সে আস্তাবলে গেল। টাঙ্গা জুততে দেখে সমস্ত কোচোয়ানরা অবাক হয়ে রইল। কেউ মজার ব্যাপার ভেবে একচোট হাসল। যারা বয়স্ক ছিল তারা নীতিকে এ কাজ না করার জন্যে বোঝাল। এ ঠিক নয়। কিন্তু নীতি তাদের কথায় কান দিল না। টাঙ্গা ঠিক-ঠাক করে নিল। পিতলের তকমাগুলি পরিষ্কার করে ঝকমক করে তুলল। ঘোড়াকে খুব আদর করল। আর অব্বুর সঙ্গে মনে মনে ভালোবাসার কথা বলতে বলতে আস্তাবলের বাইরে বেরিয়ে এল। কোচোয়ানরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল টাঙ্গা চালানোর কৌশলে নীতির নিপুণ হাত দেখে।

শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেল, সুন্দরী মেয়েমানুষ টাঙ্গা চালাচ্ছে। সমস্ত জায়গায় শুধু এই একই আলোচনা চলছিল। লোক এই আলোচনা শুনছিল আর প্রতীক্ষা করছিল কখন এই রাস্তা দিয়ে ও টাঙ্গা ছুটিয়ে যাবে।

প্রথমে প্রথমে পুরুষ-সওয়ারিরা টাঙ্গায় উঠতে দ্বিধা করছিল, কিন্তু অল্প দিনেই সে-দ্বিধা দূর হয়ে গেল। এবং খুব রোজগার হতে লাগল। এক মিনিটের জন্যেও নীতির টাঙ্গা খালি থাকত না। এক সওয়ারি নামতে না নামতেই আর একজন উঠে বসত। কে তাকে প্রথম ডেকেছে তাই নিয়ে কখনও কখনও সওয়ারিদের মধ্যে লড়াই পর্যন্ত হয়ে যেত।

কাজের চাপ যখন বেড়ে গেল তখন নীতি টাঙ্গা চালানোর সময় ঠিক করে নিল। সকাল সাতটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত, এবং দুটো থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত। এই সময়টুকুই তার নিজের কাছে সুখকর মনে হত। চুন্নীও বেশ খুশী। কিন্তু ও অনুভব করতে লাগল অধিকাংশ মানুষই তার নৈকট্যতার জন্যে টাঙ্গায় চড়ে। বিনা মতলবে, বিনা উদ্দেশ্যে ওকে এদিকে ওদিকে নিয়ে যেত। নিজেদের মধ্যে কুৎসিত ঠাট্টা তামাশা করত। শুধু ওকে শোনানোর জন্যেই এ সব কথা-বার্তা বলত। ওর মনে হতে লাগল ও নিজেকে না বেচলেও মানুষ চুপি চুপি ওকে কেনা-কাটি করছে। তাছাড়া ও জানত শহরের সমস্ত কোচোয়ানরা ওকে ভালো চোখে দেখছে না। এসব জানা সত্ত্বেও ও এতটুকু উৎকণ্ঠ ছিল না। নিজের আত্ম-বিশ্বাসের জন্যে ও সন্তুষ্ট ছিল।

একদিন মিউনিসিপ্যাল কমিটি নীতিকে ডেকে পাঠাল এবং তার লাইসেন্স কেড়ে নিল। কারণ হিসেবে বলল, "মেয়েমানুষ টাঙ্গা চালাতে পারে না।"

নীতি জিজ্ঞেস করল, "জনাব মেয়েমানুষ টাঙ্গা কেন চালাতে পারবে না?"

কমিটি জবাব দিল, 'ব্যাস, চালাতে পারবে না, তোমার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হল।"

নীতি বলল, "হুজুর, টাঙ্গা-ঘোড়াও বাজেয়াপ্ত করে নিন। কিন্তু আমাকে অন্তত এইটুকু বলুন, "মেয়েমানুষ কেন টাঙ্গা জুততে পারবে না? মেয়েরা চরকা চালিয়ে পেট চালাতে পারে, টুকরি বয়ে রোজগার করতে পারে; লাইনের ওপর কয়লা কুড়িয়ে নিজের পেটের জন্যে খাবার

সংগ্রহ করতে পারে, তবে আমি কেন টাঙ্গা চালাতে পারব না? আমি আর কোন কাজ জানি না। টাঙ্গা-ঘোড়া আমার স্বামীর। কেন আমি তা চালাতে পারব না? হুজুর আপনি দয়া করুন। মেহনত-মজদুরি আপনি কেন বন্ধ করে দিচ্ছেন? আমি কি করব? আমাকে বলে দিন।"

অফিসার বলল, "যাও, বাজারে গিয়ে বস। ঐখানে ভালো কামাই হবে।"

অফিসারের কথা শুনে নীতির ভেতর যে আসল নীতি ছিল তা জ্বলে ছাই হয়ে গেল। খুব ধীরে 'আচ্ছা জী' বলে ও বেরিয়ে এল। জলের দামে টাঙ্গা-ঘোড়া বিক্রি করে দিয়ে ও সোজা অব্দুর কবরের কাছে গেল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর চোখের জল একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল—যেমন বর্ষার পর প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ খেতের নরম নরম ভাবকে শুকিয়েদেয়। ওর বন্ধ ঠোঁট খুলে গেল। কবরকে সম্বোধন করে বলল, 'অব্দু তোর নীতি আজ কমিটির দপ্তরে মারা গিয়েছে।"

শুধু এই কথাটুকু বলে ও চলে এল। পরের দিন ও আর্জি পেশ করল। নিজের দেহ বেচার লাইসেন্স ও পেয়ে গেল।

প্রথমে টুকটাক চাকু-চালাচালি, তারপর দু-তরফের জোর লড়াইয়ের খবর আসতে লাগল। এই লড়াইয়ে চাকু, কৃপাণ, তলোয়ার এবং বন্দুক বেপরোয়া চলল। কখনও কখনও বা দেশী বোমা ফাটার খবরও আসতে লাগল।

অমৃতসরের অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা ছিল এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেশী দিন স্থায়ী হবে না। আপাতত উৎসাহ উদ্দীপনা আছে, এই উৎসাহ উদ্দীপনা মিইয়ে গেলেই অবস্থা আপসে-আপ ঠিক হয়ে যাবে। এর আগেও এরকম দাঙ্গা অমৃতসরে বার কয়েক হয়েছে। কিন্তু দাঙ্গা বেশী দিন চলেনি। খুব বেশী হলেও মেরেকেটে দশ-পনেরো দিন, তারপর অবস্থা শান্ত হয়ে থিতিয়ে পড়েছে। এর আগে যে সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করে লোকে মনে করেছে কিছুদিনের মধ্যেই দাঙ্গা থিতিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু তা না হয়ে অবস্থা দিন দিন আরও খারাপের দিকে যেতে লাগল।

হিন্দুপাড়ায় যেসব মুসলমান থাকত তারা পাড়া ছেড়ে পালাতে লাগল। আর মুসলমানপাড়ায় যেসব হিন্দু থাকত, তারা তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে সুরক্ষিত জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে শুরু করল। কিন্তু এ ব্যবস্থা যে অস্থায়ী তা বুঝতে কারো অসুবিধা হল না। কারণ দাঙ্গার এই যে বিষক্রিয়া -এই বিষক্রিয়াতে সব-কিছু জ্বলেপুড়ে খাক না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত শান্তি আসবে না।

মিঞা আবদুল হাই একজন রিটায়ার্ড সাব-জজ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, অবস্হা খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। আর তিনি খুব একটা উৎকুণ্ঠিত হয়ে ওঠেননি। তাঁর এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলের বয়স বছর এগারো আর মেয়ে সতেরো। আর ছিল বহু পুরনো এক চাকর। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। খুবই ছোট্ট পরিবার। দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর মিঞা সাহেব ঘরে বেশ কিছু রেশন মজুত করলেন। ঘরে খাবার মজুত থাকায়—তিনি অত্যন্ত এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। খোদা না করে, অবস্হা খারাপের দিকে গেলে—দোকান-পাট যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাঁকে কোন মুসিবতে পড়তে হবে না। কিন্তু তাঁর ভরা-যুবতী মেয়ে সুগরা খুবই চিন্তিত। তাঁর তেতলা বাড়ি। অন্যান্য বাড়ির চেয়ে বেশ উঁচু।

চিলে কোঠা থেকে শহরের তিন-চতুর্থাংশ বেশ ভালোভাবেই নজরে আসে। আজ কয় দিন ধরে সুগরা দেখছে আশপাশে কোথাও-না-কোথাও আগুন জ্বলছে। প্রথম প্রথম ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টার ঠনঠন শব্দ শোনা যেত। এখন আর তা শোনা যায় না। আর তাই আগুন বিস্তীর্ণ এলাকা ছড়িয়ে পড়েছে ক্রমশ।

রাতের দৃশ্যগুলো একটু ভিন্ন ধরনের। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আগুনের বিরাট বিরাট হলকা চোখে পড়ে। মনে হয় যেন কোন দেবতার মুখ দিয়ে আগুনের ফোয়ারা ছুটছে। আর কিম্ভুত কিম্ভুত আওয়াজ শোনা যায়—'হর হর মহাদেও' আর 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি মিলে মিশে এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে।

সুগরা ভয়ে শিটকিয়ে এ ঘটনা আর তার বাবার কানে তোলেনি। তোলেনি, কারণ এর আগেও সে বলেছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। মিঞা সাহেবের বলার ধরনই এমন—যেন কিছুই হয়নি। বাবার এইরকম কথা বলার ধরনে তার মধ্যেও কিছুটা ভরসা আসত। কিন্তু যখন বৈদ্যুতিক তার কেটে দিল এবং জল বন্ধ হয়ে গেল তখন সুগরা মিঞা সাহেবকে তার উদ্বেগের কারণ জানাল। ভয়ে সন্ত্রস্ত সুগরা বলল অন্তত কিছুদিনের জন্যে হলেও শরিফপুরে চলে যেতে। কারণ শরিফপুরেই প্রতিবেশী মুসলমানরা যাচ্ছে। মিঞা সাহেব তাঁর যে রায় সেই রায়েই অটল রইলেন। বললেন "মিছিমিছি তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? অবস্থা খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু অবস্থা ঠিক না হয়ে বরং আরও খারাপের দিকে চলে গেল। যে পাড়ায় মিঞা আবদুল হাই থাকতেন, সেই পাড়ার মুসলমানরা পাড়া উজাড় করে পালিয়ে গেল। আর এদিকে ভগবানের অসীম কৃপায় একদিন মিঞা সাহেব পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। ছেলে বশরত আগে একা-একাই গোটা বাড়িতে উপরে নীচে ছোটাছুটি এবং নানারকম খেলা খেলত। কিন্তু বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে সে বাবার খাটিয়া ধরে বসে পড়ল এবং অবস্থার গতি অনুভব করার চেষ্টা করতে লাগল।

তাদের বাড়ির লাগোয়া বাজার। সেই বাজার একেবারে নিস্তব্ধ। ডাক্তার গুলাম মুস্তাফার ডিসপেন্সারি বহুদিন থেকে বন্ধ পড়ে রয়েছে। গুলাম মোস্তাফার ডিসপেন্সারি ছাড়িয়ে ডাঃ গুরাদিত্তার ডাক্তারখানা। ঝুল বারান্দা

থেকেই সুগরা দেখল, তাঁর ডিসপেন্সারিতেও তালা ঝুলছে। এদিকে মিঞা সাহেবের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। কী করবে সুগরা কিছুই বুঝতে পারল। কিছুই সে চিন্তা করতে পারছিল না। বশরতকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে সে বলল, "খোদার দিব্যি দিয়ে বলছি, বশরত, এখন তুমিই কিছু একটা উপায় করো। জানি এখন বাইরে বেরোলে খুব বিপদ। কিন্তু তোমাকেই যেতে হবে—কাউকে ডেকে আনো। আব্বার অবস্থা খুবই খারাপ।"

বশরত বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বেরুতে না বেরুতেই সে আবার ছুটে ফিরে এল। ওর মুখ কেমন হলুদের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। চকে রক্তে লতপত একটা লাশ সে দেখতে পায়। আর সেই লাশের কাছেই এক দঙ্গল মানুষ একটা দোকান লুট করছে। সুগরা ভয়ে জড়সড় তার ভাইকে দু হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। এবং অবসন্ন হয়ে বসে পড়ে। আর এদিকে বাবার যে অবস্থা তাও সে আর সহ্য করতে পার ছল না। মিঞা সাহেবের বাঁ অঙ্গে কোন অনুভবশক্তি ছিল না। যেন তাতে প্রাণের কোন চিহ্নমাত্র নেই। কথাও কেমন জড়িয়ে গিয়েছিল। বেশীর ভাগ সময়েই তিনি ইশারায় কথা বলতেন। ইশারায় তিনি যেন বলতেন, সুগরা, ভয়ের কোন কারণ নেই। খোদার মেহেরবানিতে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই ঠিক হল না। রোজার মাস শেষ হয়ে আসছিল। আর মাত্র দুদিন বাকী। মিঞা সাহেবের ভরসা ছিল, ঈদের আগেই অবস্থা বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মনে হচ্ছিল, ঈদের দিনই যেন কেয়ামতের দিন আসছে। কারণ চিলেকোঠা থেকে শহরের প্রায় সব জায়গায় ধোঁয়া দেখা যেত। রাত্রে বোমা ফাটার এমন বিকট আওয়াজ শোনা যেত যে সারা রাত্রি একদণ্ডের জন্যেও সুগরা আর বশরত দুচোখ এক করতে পারত না। এমনি বাবার সেবাশুশ্রূষার জন্যে সুগরাকে রাত জাগতে হত। কিন্তু এখন এই বোমা ফাটার বিকট আওয়াজ যেন তার মগজে গেঁথে বসে গিয়েছে। একবার সে তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবার দিকে তাকাত, আর একবার ভীত-সন্ত্রস্ত তার ভায়ের দিকে। আর সত্তর বছরের বুড়ো চাকর আকবর—সে বাড়িতে থাকা আর না-থাকা দু'-ই সমান। সারা দিন-রাত নিজের ঘরে পড়ে খকখক কেশেই চলেছে আর গাদায় গাদায় কফ ফেলছে।

একদিন সুগরা রাগে দিশেহারা হয়ে তাকে গালিগালাজ করে বলল,

"তুমি কোন কম্মের নও। দেখতে পাচ্ছ না মিঞা সাহেবের কী অবস্থা। তুমি হচ্ছ এক নম্বরের নিমকহারাম। এখন যখন মিঞা সাহেবের জন্যে কিছু করা দরকার তখন তুমি কাশতে কাশতে দম বন্ধ হওয়ার ভড়ং দেখাচ্ছ। যারা সত্যিকার নোকর তারা প্রভুর জন্যে নিজেকে বলি দিতেও দ্বিধা করে না।"

সুগরা গালিগালাজ দিয়ে তার মনটাকে কিছুটা হালকা করে চলে গেল। কিন্তু পরে তার খুব অনুতাপ হল। কী প্রয়োজন ছিল এই গরিব বেচারাকে গালিগালাজ করার। রাত্রে আকবরের জন্যে একটা থালাতে খাবার বেড়ে সে যখন তার ঘরে গেল, দেখল আকবরের ঘর খালি। বশরত সমস্ত ঘর তোলপাড় করে খুঁজল। কিন্তু আকবরকে পাওয়া গেল না। সদর দরজার খিল খোলা। সুগরা বুঝতে পারল, মিঞা সাহেবের জন্যে সে বাইরে গিয়েছে। সুগরা খোদার কাছে মোনাজাত করল, খোদা ওর যেন কিছু না হয়। দুদিন পেরিয়ে গেল। কিন্তু আকবর আর ফিরে এল না।

সন্ধ্যার সময়। এমন অনেক সন্ধ্যা সুগরা আর বশরত দেখেছে। যে সন্ধ্যায় ঈদের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। আকাশে একচিলতে চাঁদ দেখার জন্যে তারা কত উৎসাহ আর আকুতি নিয়েই না তাকিয়ে থাকত। পরের দিন ঈদ। আজকে শুধু চাঁদকে প্রার্থনা করার দিন। এক ঝলক দেখার জন্যে তারা দুজনেই কত উতলা থাকত। আকাশে যেখানে চাঁদ ওঠে সেখানে যদি ঘন মেঘ দিয়ে ঢেকে যেত, তবে কী রাগই না তাদের হত। কিন্তু আজকের সারা আকাশ ধোঁয়ার মেঘে ঢেকে গিয়েছে। সুগরা আর বশরত দুজনে চিলেকোঠায় চড়ল। দূরে কোন কোন বাড়িতে অন্ধকারের মধ্যে মানুষজনের আবছা মূর্তি দেখা যাচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল না তারা চাঁদ দেখছে, না ধিকধিক আগুন দেখছে।

আজ যেন চাঁদও বেশ কুশলী হয়ে উঠেছে। ধোঁয়ার যে পুরু পর্দা তার ফাঁক দিয়ে সে মুখ বাড়াল। সুগরা দু' করতল তুলে প্রার্থনা করল, খোদা, তুমি মেহেরবানি করে আমার আব্বাজানকে সুস্থ করে দাও। আর বশরতের এমন রাগ হচ্ছিল যে, কী এক হাঙ্গামা এসে ঈদের এই সুন্দর দিনটাকেই মাটি করে দিয়ে গেল।

দিন তখনও পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েনি। সন্ধ্যার যে অন্ধকার তা তখনও তেমন গাঢ় হয়নি। জল-ছিটানো উঠোনে মিঞা সাহেবের চারপাই পেতে দেওয়া হয়েছিল। চারপায়ের ওপর তিনি নিস্পন্দের মতো শুয়ে ছিলেন।

তাঁর চোখ দুটি আকাশের দিকে স্থির নিবদ্ধ। কী যেন ভাবছিলেন। ঈদের চাঁদ দেখে এসে সুগরা তাঁকে সেলাম করল। উনি ইশারাতে সুগরাকে উত্তর দিলেন। সুগরা মাথা ঝোকালে, যে হাতে বল আছে সে হাত তুলে তিনি ওর মাথায় স্নেহে হাত বুলাতে লাগলেন। সুগরার দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। মিঞা সাহেবেরও দু-চোখ জলে ভরে উঠল। তিনি সুগরাকে সাহস দেয়ার জন্যে অনেক কষ্টে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, "আল্লাহ-তআলা সব ঠিক করে দেবে।"

ঠিক এই সময় সদর দরজায় কেউ ঠকঠক করল। মিঞা সাহেব সুগারকে বললেন, "দেখ তো, কে এসেছে।"

সুগরা ভাবল, হয়তো আকবর ফিরে এসেছে। তার দু চোখ আনন্দে চকমক করে উঠল। বশরতের হাত ধরে বলল, "মনে হচ্ছে আকবর এসেছে। একবার গিয়ে দেখে এসো।"

সুগরার কথা শুনে মিঞা সাহেব মাথা নাড়িয়ে যেন বললেন, 'না, না, আকবর নয়, অন্য কেউ।'

সুগরা তার বাবাকে বলল, 'আকবর না হলে আর কে হতে পারে আব্বা?'

মিঞা আবদুল হাই তাঁর কণ্ঠের সমস্ত শক্তি দিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই বশরত ফিরে এল। ভয়ে সে কাঁপছিল; বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছিল। বশরত সুগরাকে এক ধাক্কা দিয়ে চারপাই থেকে সরিয়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "একজন শিখ এসেছে।"

সুগরা ভয়ে চীৎকার করে উঠল ; "শিখ ! কী বলছিস ?"

বশরত বলল, "দরজা খুলতে বলছে।"

সুগরা এক ঝটকায় বশরতকে টেনে জড়িয়ে ধরল। বাবাকেও চারপাইয়ের ওপর এক লহমায় তুলে বসিয়ে দিল। এবং ভাবলেশহীন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ মিঞা সাহেবের পাতলা দু'ই ঠোঁটের ওপর এক অদ্ভুত মিষ্টি হাসি খেলে গেল। বললেন, "যাও, দরজা খুলে দাও…গুরমুখ সিং এসেছে।"

বশরত প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, "না, গুরমুখ সিং নয়, অন্য কেউ।"

মিঞা সাহেব নিশ্চিন্ত ভাবে আবার বললেন, "সুগরা, দরজা খুলে দাও, গুরমুখই এসেছে।"

সুগরা উঠে দাঁড়াল। গুরমুখ সিংকে সে চেনে। পেনসন নেওয়ার

আগে তার বাবা এই শিখের একটা কাজ করে দেন। ব্যাপারটা কী ঘটেছিল তা সুগরার অত ভালোভাবে মনে নেই। বোধ হয় তাকে এক মিথ্যে মামলা থেকে তার বাবা বাঁচিয়েছিলেন। তারপর থেকে প্রতিটি রমজানের ঈদের আগের দিন সে রুমালী সেওই-এর এক থলি নিয়ে তাদের বাড়িতে আসে। তার বাবা বহুবার তাকে বলেছেন, "সর্দারজী, আপনি কেন মিছিমিছি এই কষ্ট করেন?" হাত জোড় করে সে বলত, "মিঞা সাহেব, বাহে গুরুজীর কৃপায় আপনার সব কিছুই আছে। এ এক সামান্য উপহার। আমি জনাবের খিদমতের জন্যে এর বেশী আর কী করতে পারি। আপনি আমার জন্যে যা করেছেন, আমার একশ পুরুষও সে ঋণ শোধ করতে পারবে না। ভগবান আপনার ভালো করুন।"

প্রতি বছর ঈদের আগের দিন গুরমুখ সিং সেওই-এর থলে নিয়ে আসত। তার এই আসা সুগরার এত পরিচিত যে, আজকে সে কেন তার ঠকঠক শব্দ শুনেও বুঝতে পারল না। বশরতও দশ বছর ধরে তাকে দেখে আসছে। ও কেন বলল, গুরমুখ সিং নয়; অন্য কেউ এসেছে। আর কেই-ই বা হতে পারে! ভাবতে ভাবতে সুগরা সদর দরজার কাছে গেল। দরজা খুলবে, না এখান থেকে জিজ্ঞেস করবে, 'কে'। এমন সময় আবার দরজায় ঠকঠক আওয়াজ হল। সুগরার বুক ভয়ে জোরে জোরে ওঠা-নাম করতে লাগল। কোনরকমে সে গলা দিয়ে আওয়াজ বের করে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

বাইরে থেকে আওয়াজ এল, "আজ্ঞে···আজ্ঞে···আমি···আমি সর্দার গুরমুখ সিং-এর ছেলে···সন্তোখ।"

সুগরার সাহস কিছুটা ফিরে এল। বেশ নম্রতা এবং ভদ্রতার সঙ্গে সে বলল, "আপনি কিভাবে এলেন?"

বাইরে থেকে জবাব এল, "সাহেব কোথায়?"

সুগরা বলল, "তিনি অসুস্থ।"

সর্দার সন্তোখ সিং ব্যথিত হয়ে বলল, "ওহ···" তারপর সে কাগজের ঠোঙায় একটা খরখর শব্দ করে বলল, "সেওই নিয়ে এসেছি···সর্দারজী পরলোক গমন করেছেন···মারা গিয়েছেন।"

সুগরা জিজ্ঞেস করল, "মারা গিয়েছেন?"

বাইরে থেকে জবাব এল, "আজ্ঞে, হাঁ···গত এক মাস হল মারা গিয়েছেন··· মারা যাওয়ার আগে বলে গিয়েছেন, 'দেখ, জজ সাহেবের জন্যে দশ বছর ধরে

শ্মশানের ঈদে সেওই নিয়ে যাই। আমার মৃত্যুর পর এ কাজ তোমাকে করতে হবে।' আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছি…ওয়াদা রাখতে এসেছি… সেওইটা নিন।"

সন্তোখ সিং-এর কথা শুনে সুগরার দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। দরজাটা সে একটু ফাঁক করল। সর্দার গুরমুখ সিং-এর ছেলে সেওই-এর ঠোঙাটা সামনে এগিয়ে ধরল। সুগরা ঠোঙাটা এক হাতে নিয়ে বলল, "খোদা, সর্দারজীকে দীর্ঘায়ু করুন।"

গুরমুখ সিং-এর ছেলে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, "জজ সাহেব কি অসুস্থ?"

সুগার বলল, "জী, হ্যাঁ,।"

"কি অসুখ হয়েছে?"

"পক্ষাঘাত।"

"ইস,…সর্দারজী যদি বেঁচে থাকতেন, শুনলে খুব দুঃখ পেতেন… মৃত্যুর আগেও জজ সাহেবের কথা বলেছেন। বলতেন, জজ সাহেব মানুষ নন, দেবতা।…ভগবান যেন তাঁর আয়ু দেন।…ওঁকে আমার প্রণাম জানাবেন।"

সন্তোখ সিং এই দুচারটি কথা বলে উঠোন থেকে আবার রাস্তায় নামল। সুগরা একবার মনে মনে ভাবল, বলে—জজ সাহেবের জন্যে একজন ডাক্তার ডেকে দিতে।

সর্দার গুরমুখ সিং-এর ছেলে সন্তোখ সিং জজ সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগুতেই চারজন লোক তাকে ঘিরে ধরল।

দুজনের হাতে জ্বলন্ত মশাল। আর দুজনের হাতে কেরোসিনের টিন এবং আগুন লাগানের অন্যান্য জিনিস।

তাদের একজন সন্তোখ সিংকে জিজ্ঞেস করল, "কী সর্দারজী, তোমার কাজ হয়ে গিয়েছে তো?

সন্তোখ মাথা কাত করে বলল, "হ্যাঁ, হয়ে গিয়েছে।"

লোকটি বেশ দেমাকের সঙ্গে হেসে জিজ্ঞেস করল, "তবে এখন জজ সাহেবের মামলা ঠাণ্ডা করে দিই।"

"হ্যাঁ…তোমাদের যা মর্জি কর," বলে সর্দার গুরমুখ সিং-এর ছেলে হাঁটতে শুরু করল।

দিল্লী আসার আগে ও আম্বালা ছাউনিতে থাকত, সেখানে কয়েকজন গোরা ওর খদ্দের ছিল। এই গোরাদের সঙ্গে মেলামেশার জন্যে ও দশ-পনেরোটা ইংরেজী শব্দ শিখে গিয়েছিল। ওদের কাছ থেকে শেখা এইসব শব্দ ও অবশ্য সব সময় ব্যবহার করত না। কিন্তু দিল্লী এসে ওর কারবার যখন মন্দা হল তখন ও ওর প্রতিবেশী তমনচা জানকে বলল, "দিস লাইফ ভেরি ব্যাড। —এই জীবন এত কষ্টকর যে একটু খাবারও জোগাড় হয় না।"

আম্বালা ছাউনিতে ওর ধান্ধা খুব ভালোভাবে চলত। ছাউনির গোরারা মদ খেয়ে ওর কাছে আসত। আর ও তিন চার ঘণ্টার মধ্যে আট দশটি গোরার সঙ্গে কাজ-কারবার পুরো করে বিশ ত্রিশ টাকা রোজগার করে নিত। আর এই গোরারাই ওর দেশের লোকদের মোকাবিলা করার জন্যে খুব জবরদস্ত ছিল। এর অর্থ, অবশ্য এই নয় যে, গোরারা যে ভাষায় কথা বলত তা সুলতানা বুঝতে পারত না, বরং এই ভাষা না জেনে সুলতানা ভালোই করেছিল। যদি তারা ওর কাছে কিছু জানতে চাইত তবে ও মাথা কাত করে বলত, "সাহেব, তোমাদের কথা আমি বুঝি না।" আর তারা যদি বেশী জবরদস্তি করত তবে ও নিজের ভাষায় তাদের গালি-গালাজ দিত। তারা যদি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত তবে ও বলত, "সাহেব, তোমরা একেবারে উল্লু কা পট্ঠা। হারামজাদা—বুঝেছ?" যখন সাহেবদের এইভাবে গালিগালাজ করত তখন ওর কণ্ঠে কোন তেজ থাকত না, বরং ভালোবাসায় গদগদ হয়ে বলত। ওরা যখন হাসত তখন ওদের মুখ দেখে সুলতানার মনে হত যেন বিলকুল উল্লু কে পট্ঠে।

কিন্তু এখানে, দিল্লীতে ও যতদিন হয় এসেছে তার মধ্যে একদিনও কোন গোরা ওর কাছে আসেনি। তিন মাস ধরে ও হিন্দুস্থানের এই শহরে আছে. শুনেছে এই শহরে বড় লাট সাহেব থাকেন—যিনি গরমের সময় সিমলাতে যান। এই তিন মাসে মাত্র ছ'জন মানুষ ওর কাছে এসেছে। মাত্র ছ'জন অর্থাৎ মাসে দু'জন। আর এই ছ'জন খদ্দেরের কাছ থেকে খোদার নামে শপথ করে বলা যায় ও মাত্র সাড়ে আঠোরো টাকা কামিয়েছে। তিন

তিন টাকার চেয়ে বেশী কেউ দিতেই চায় না। এই ছ'জনের মধ্যে পাঁচ জনের কাছে সুলতানা তার রেট দশ টাকা বলেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা তারা প্রত্যেকেই বলেছিল, তিন টাকার বেশী এক কানা কড়িও দেব না। জানি না কেন তারা প্রত্যেকেই ওকে তিন টাকার সামগ্রী ভাবল। তাই ষষ্ঠ খদ্দের যখন এল তখন ও নিজেই তাকে বলল, দেখ, "আমি পুরো তিন টাকা নেব। এর এক-আধলা কম বললে হবে না। তোমার মর্জি হয়তো থাক, নয় চলে যাও।" ষষ্ঠ খদ্দেরটি ওর এই জবাব শুনে কোন দর-দাম না করে রাজি হয়ে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ করে যখন নিজের কোট খুলতে লাগল তখন সুলতানা তাকে বলল, "দুধের জন্যে একটা টাকা দাও দেখি।"

পুরো একটাকা সে সুলতানাকে দিল না, নতুন রাজার একটা চকচকে আধুলি পকেট থেকে বের করে দিল। আর সুলতানাও চটপট সেই আধুলিটা নিয়ে নিল, যা পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট।

তিন মাসে সাড়ে আঠোরো টাকা। মাসে বিশ টাকা তো এই বাড়িরই ভাড়া—যাকে বাড়ির মালিকরা ইংরাজীতে 'ফ্ল্যাট' বলে। এই ফ্ল্যাটে এমন স্যানেটারি ব্যবস্থা ছিল যে; লোহার শিকল ধরে টানলেই সমস্ত নোংরা জলের তোরে একেবারে নীচের নর্দমায় হাওয়া হয়ে যেত এবং খুব শব্দ হত। প্রথম প্রথম এই শব্দে ও খুব ভয় পেয়ে যেত। প্রথম দিন ও যখন পায়খানায় গেল সেদিন ওর কোমরে একটা টনটনে ব্যথা হচ্ছিল। কাজ সেরে উঠতে গিয়ে ও এই শিকল ধরে নিজেকে কোন মতে সামলে নেয়। এই শিকল দেখে ও ভেবে ছিল, তাদের যাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্যেই হয়তো এই বাড়িতে শিকল ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। কারো কোন অসুবিধা হলে যাতে এই শিকলের সাহায্য নিতে পারে। কিন্তু যেই ও শিকল ধরে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, তখন ওপরে খট করে একটি আওয়াজ হল। আর জল এমন তোরে শব্দ করে বের হল যে ভয়ে ও চীৎকার করে উঠল।

খোদাবক্স তখন অন্য একটা ঘরে নিজের ফটোগ্রাফির জিনিস পত্র গোছ-গাছ করছিল এবং পরিষ্কার একটি বোতলে হাইড্রো-ক্লোরাইন ঢালছিল। সুলতানার চীৎকার শুনে সে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সুলতানাকে জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার, কি হয়েছে। তুমিই কি চীৎকার করেছিলে?"

সুলতানার বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। ও বলল, "পায়খানায় এটা কি। মাঝখানে রেলগাড়ির মতো এটা কি ঝুলিয়ে রেখেছে। আমার কোমরে ব্যথা। ভাবলাম, এটা ধরে দাঁড়াই। যেই না আমি শিকল ধরে টানলাম অমনি তা এমন শব্দ করে উঠল যে তোমাকে আমি কি বলব!"

শুনে খোদাবক্স একচোট হাসল। তারপর সে এই স্যানেটারি সম্পর্কে সুলতানাকে সব বুঝিয়ে দিল। বলল, "এ এক নতুন ফ্যাশান, শিকল ধরে টানলেই সমস্ত নোংরা নীচে নেমে যায়।"

খোদাবক্স আর সুলতানার মধ্যে আপনা থেকেই কিভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। খোদাবক্স এক সময় রাওলপিণ্ডিতে থাকত। এণ্ট্রেন্স পাশ করার পর সে লরি চালানো শেখে, আর চার বছর ধরে সে রাওলপিণ্ডি থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত লরি চালানোর কাজ করত। সেই সময় কাশ্মীরে এক মেয়ের সঙ্গে তার ভাব হয়। সেখান থেকে সে তাকে ভাগিয়ে নিয়ে আসে। লাহোরে সে কোন কাজ জোগার করতে না পারায় মেয়েটিকে সে পেশায় লাগিয়ে দেয়। দু-তিন বছর এই ভাবেই চলে, কিন্তু একদিন সেই মেয়েটি অন্য একজনের সঙ্গে পালিয়ে যায়। খোদাবক্স জানতে পারল সে আম্বালায় আছে। সে তার খোঁজে সেখানে আসে আর সুলতানাকে পায়। সুলতানাও তাকে পছন্দ করে, পরে দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

খোদাবক্স সেখানে আসতেই সুলতানার কারবার হু হু করে বেড়ে ওঠে। মেয়েমানুষেরা সাধারনত অন্ধ বিশ্বাসী, তাই সুলতানা ভাবল খোদাবক্স ভগবান। কারণ সে আসাতেই ওর বাজার এত রমরমা হয়েছে। এই বিশ্বাসের জন্যে খোদাবক্সের মর্যাদা ওর কাছে আরও বেড়ে গেল।

খোদাবক্স ছিল পরিশ্রমী মানুষ। সারা দিন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকা সে মোটেই পছন্দ করত না। একজন ফটোগ্রাফারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে বক্স-ক্যামেরা দিয়ে সে ফটো তুলতো। তার কাছ থেকেই খোদাবক্স ফটো তোলার কাজ শিখে নিল, এবং সুলতানার কাছ থেকে ষাট টাকা নিয়ে একটা ক্যামেরাও কিনে ফেলল। ধীরে ধীরে একটা পর্দা তৈরী করাল, দুটো চেয়ার কিনল এবং ফটো ধোয়ার সমস্ত সরঞ্জাম কিনে সে নিজেই কারবার খুলে বসল।

কারবার ভালোই চলছিল। খুব অল্প দিনের মধ্যেই আম্বালা ছাউনিতে

সে জাঁকিয়ে বসল। এখানে সে গোরাদের ফটো তুলত। এক মাসের মধ্যেই ছাউনির অনেক গোরার সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল। এবং পরে সুলতানাকে সে তাদের কাছে নিয়ে আসতে লাগল। খোদাবক্সের মাধ্যমে ছাউনির অনেক গোরাই সুলতানার খদ্দের হয়ে গেল।

সুলতানা কানের দুল কিনল। পাঁচ তোলার আটটি কঙ্কনও তৈরী করাল। দশ-পনেরোটা দামী দামী শাড়িও কিনল। ঘরে ফার্নিচার ও অন্যান্য জিনিসও এল। এই আম্বালা ছাউনিতে বেশ সুখেই ছিল, কিন্তু হঠাৎ খোদাবক্সের মনে কি হল তা কে জানে, সে দিল্লী চলে আসা ঠিক করল। সুলতানা খোলাবক্সকে কিভাবে না করে, কারণ খোদাবক্সকে ও নিজের সৌভাগ্য বলে বিশ্বাস করে। ও হাসিমুখেই দিল্লী যাওয়ার প্রস্তাব মেনে নিল। ও ভেবেছিল এত বড় শহর যেখানে লাট সাহেব থাকেন সেখানে ওর ধান্দা আরও ভালোভাবে চলবে। নিজে দিল্লীর অনেক প্রশংসা শুনেছিল। তাছাড়া সেখানে হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজার আছে। এই মাজার সম্পর্কে ওর মনে অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। দেরী না করে ঘরের সমস্ত আসবার পত্র বিক্রি করে খোদাবক্সের সঙ্গে ও দিল্লী চলে এল। এখানে এসে খোদাবক্স বিশ টাকায় এই ফ্ল্যাট ভাড়া নিল এবং দু'জনে একসঙ্গে থাকতে লাগল।

একই রকম দেখতে নতুন বাড়িগুলো রাস্তার পাশ দিয়ে এক কাতারে বহুদূর চলে গিয়েছিল। মিউনিসিপ্যাল কমিটি শহরের এই অংশ বেশ্যাদের জন্যেই বানিয়ে দিয়েছিল। যাতে এরা শহরের যেখানে-সেখানে ঘাঁটি গেড়ে না বসে। নীচে দোকান আর ওপরে এই ফ্ল্যাট। সমস্ত দালানগুলি একই ডিজাইনে তৈরী হয়েছিল বলে মাঝে মাঝে নিজের ফ্ল্যাট খুঁজে বের করতে ওকে অসুবিধায় পড়তে হত। কিন্তু লণ্ড্রিওয়ালা যখন তার দোকানে সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে দিল তখন ওর নিশানা ঠিক হয়ে গেল।

'এখানে ময়লা কাপড় ধোলাই করা হয়'—বোর্ডের এই লেখা পড়েই ও নিজের ফ্ল্যাট চিনে নিতে পারত! এই রকম আরও অনেক নিশানা ও ঠিক করে নিয়েছিল। যেখানে বড় বড় হরফে 'কয়লার দোকান' লেখা সেখানে ওর বান্ধবী হীরা বাঈ থাকত, সে মাঝে মাঝে রেডিওতে গান গাইতে যেত। যেখানে 'ভদ্রলোকদের জন্যে নানারকম খাবার পাওয়া যায়' লেখা আছে সেখানে ওর আর এক বান্ধবী মুখতার থাকত। নেওরারের কারখানার

ওপরে অনবরী থাকত। সে ঐ কারখানার শেঠের কাছে চাকরী করত। রাত্রেও শেঠকে কারখানা দেখা-শোনা করত হত বলে সে অনবরীর কাছেই থেকে যেত।

কারবার চালু হওয়ার পর সাধারণত খুব অল্প খরিদ্দারই আসে। কিন্তু যখন এক মাস সুলতানা বেকার থাকল তখন ও নিজের মনকে বোঝাল। কিন্তু দু'মাস চলে যাওয়ার পরও যখন কোন মানুষ তার ঘরে এল না তখন ও খুব চিন্তায় পড়ে গেল। ও খোদাবক্সকে বলল, "খোদাবক্স পুরো দু'-মাস হয় আমি এখানে এসেছি, এর মধ্যে কেউ আমার ঘরে এল না। জানি, আজকাল বাজার খুব মন্দা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে মাস ভর কারো মুখ দেখব না।"

খোদাবক্সের নিজেরই এ ব্যাপার খটকা ঠেকছিল, কিন্তু সে চুপ করেছিল। সুলতানা যখন নিজে থেকে কথা তুলল তখন সে বলল, "আমিও ক'দিন থেকে এই কথাই ভাবছি। একটা ব্যাপার মনে হচ্ছে, যুদ্ধের জন্যে লোক-জন বিভিন্ন চক্করে পড়ে এই রাস্তা ভুলে গিয়েছে। কিম্বা এও হতে পারে……" সে কথা শেষ করার আগেই সিঁড়িতে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল। খোদাবক্স এবং সুলতানা—দু'জন সিঁড়ির সেই আওয়াজের দিকে তাকাল।

দরজায় কেউ একজন শব্দ করল। খোদাবক্স লাফিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। একজন লোক ভেতরে ঢুকল। এ ছিল প্রথম খদ্দের, যে তিন টাকায় রফা করল। এর পর আরও পাঁচজন আসে, অর্থাৎ তিন মাসে ছ'জন, যাদের কাছ থেকে সুলতানা মাত্র সাড়ে আঠারো টাকা উশুল করে।

বিশ টাকা তো ওই ফ্ল্যাটেরই ভাড়া। তাছাড়া জলের ট্যাক্স, ইলেকট্রিক বিল, খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড়, ওষুধ-টষুধের খরচ তো পৃথক। অথচ কোন আমদানী নেই। তিন মাসে সাড়ে আঠারো টাকাকে কোন আমদানী বলা যায় না। সুলতানা খুব চিন্তায় পড়ে গেল। সাড়ে পাঁচ তোলার যে আটটি কঙ্কন ও আম্বালায় বানিয়ে ছিল তা এক এক করে বিক্রি করে দিল। শেষ কঙ্কনটি যখন বিক্রি করার সময় এল তখন ও খোদাবক্সকে বলল, "তুমি আমার কথা শোন, চল আম্বালায় ফিরে যাই। এখানে কি আছে?…তোমার হয়তো ভালো লাগছে, কিন্তু এই শহর থেকে আমার মন উবে গেছে। তোমার কাজ-কারবারও তো আম্বালাতে ভালো চলত। চল,

সেখানেই ফিরে যাই। যা ক্ষতি হয়েছে তা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর। যাও এই কঙ্কনটা বেচে এস। আমি জিনিস-পত্র বেঁধে-টেধে তৈরী থাকছি। আজকে রাতের গাড়িতে এখান থেকে রওনা হব।"

খোদাবক্স সুলতানার হাত থেকে কঙ্কনটা নিয়ে বলল, 'আম্বালায় ফিরে যাওয়ার আর ইচ্ছে নেই। এই দিল্লীতে থেকেই কামাব। তোমার এই চুড়ি এক এক করে আবার ফিরিয়ে আনব। আল্লার ওপর ভরসা রাখ। এ আল্লার কারসাজি। এখানেও তিনি একদিন কোন না কোন পথ বাতলিয়ে দেবেন।"

কিন্তু যখন পাঁচ পাঁচটি মাস চলে গেল এবং খরচের তুলনায় আমদানী এক চতুর্থাংশেরও কম হতে লাগল তখন সুলতানা খুব চিন্তায় পড়ে গেল। খোদাবক্সও এখন প্রায়ই সারা দিন কোথাও উধাও হয়ে থাকতে লাগল। সেজন্যেও সুলতানার মনে দুঃখ ছিল। অবশ্য আশ-পাশে মেলা-মেশা করার মতো দু-একজনের সঙ্গে যে ওর পরিচয় ছিল না তা নয়, যাদের সঙ্গে ও কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু প্রতিদিন তাদের ওখানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গল্পগুজব করা ওর কাছে ভালো লাগত না। আস্তে আস্তে ও ওর এই বান্ধবীদের সঙ্গেও মেলা-মেশা বন্ধ করে দিল। সারা দিন ও ওর নিজের ফাঁকা ঘরেই চুপচাপ বসে থাকত। কখনও ও সুপুরি কাটত, কখনও পুরনো আর ছেঁড়া-ফাটা জামা-কাপড় সেলাই করত। কখনও বাইরের ব্যালকনিতে এসে জানালার সঙ্গে ঠেস দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে সামনের রেলওয়ে শেডের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা বা চলন্ত ইঞ্জিনের দিকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ও তাকিয়ে থাকত।

রাস্তার অন্য দিকে ছিল মাল-গুদাম, যে মাল-গুদাম এক দিক থেকে আরেক দিক পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ডান দিকে টিনের শেডের নীচে বড় বড় গাঁট পড়ে থাকত, আর চারদিকে নানা রকমের জিনিস-পত্রে স্তূপাকার। বাঁয়ে খোলা মাঠ, যে খোলা মাঠে অসংখ্য লাইন বিছানো। রৌদ্রে লোহার এই লাইনগুলো যখন ঝকমক করে উঠত তখন সুলতানা নিজের হাতের দিকে তাকাত। ওর হাতের নীল নীল শিরাগুলোও ঐ লাইনের মতোই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। এই দীর্ঘ আর খোলা মাঠে সব সময় ইঞ্জিন আর গাড়ি চলাচল করত। কখনও এ দিকে যাচ্ছে, কখনও ওদিকে। ইঞ্জিন আর গাড়ির ঝিকঝিক আওয়াজ সব সময়ে লেগেই থাকত। খুব ভোরে ও

যখন ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াত তখন এই দৃশ্য বড় অদ্ভুত দেখাত। কুয়াশার মধ্যে যখন ইঞ্জিনের মুখ দিয়ে ঘন ধোঁয়া বের হয়ে অপরিচ্ছন্ন আকাশের দিকে উঠত তখন মনে হত যেন মোটা সোটা আর নাদুস-নুদুস মানুষগুলো এক এক করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। বাষ্পের বড় বড় জলবিন্দুগুলিও রেল-লাইন থেকে আওয়াজ করে বের হয়ে আসত এবং চোখ মিটমিট করতে করতে হাওয়ায় মিসিয়ে যেত। যখন গাড়ির কামড়াগুলোকে এক ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিত তখন ওর নিজের কথা খুব বেশী করে মনে পড়ে যেত। ওর মনে হত কেউ ওর জীবনের লাইনে এক ধাক্কা দিয়ে ওকে ছেড়ে দিয়েছে। আর ও আপনা-আপনি সেই লাইন ধরে এগিয়ে চলেছে। অন্যান্য সবাই লাইন বদল করছে, আর ও ছুটেই চলেছে—না জানি কোন্ দিকে চলেছে! এমন একদিন আসবে যখন এই ধাক্কার জোর আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে আর ও কোথাও এসে একেবারে থেমে যাবে। এমন এক জায়গায় থেমে যাবে যেখানে ওর দেখাশোনা করার কেউ থাকবে না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেলের এই এঁকে-বেঁকে যাওয়া লাইন, আর দাঁড়িয়ে থাকা বা চলন্ত ইঞ্জিনের দিকে ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাকিয়ে থাকত। আর একটার পর একটা কল্পনা ওর মনে খেলে যেত। যখন ও আম্বালা ছাউনিতে থাকত তখন ওর ঘর স্টেশনের খুব কাছেই ছিল। কিন্তু যেখানে ও কোন দিন এইসব দৃশ্যগুলোকে এভাবে দেখার চেষ্টা করেনি। কখনও কখনও ওর মনে হত সামনে জালের মতো বিছানো এই রেল-লাইন এবং মাঝে মাঝে যে বাষ্প আর ধোঁয়া উঠছে তা যেন এক বিরাট বেশ্যাখানা। সেখানে অসংখ্য গাড়ি ছিল আর তার মাঝে বেশ কিছু বড়সর ভারি ইঞ্জিন এদিক থেকে ওদিক টহল দিচ্ছিল। এই ইঞ্জিনগুলোকে দেখলে সুলতানার সেঠজী বলে মনে হত, যারা আম্বালাতে কখনও কখনও ওর ঘরে যাতায়াত করত। আবার যখন কোন ইঞ্জিন ধীরে ধীরে সার সার গাড়ির পাশ দিয়ে চলে যেত, তখন ওর মনে হত কেউ যেন বেশ্যাপট্টির মাঝ দিয়ে ওপরের ঘরের দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে।

সুলতানা জানত এই ধরনের উদ্ভট চিন্তা মাথার গণ্ডগোল থেকেই হয়। যখন প্রায় সব সময়েই ওর এই ধরনের উদ্ভট কল্পনা হতে লাগল, তখন ও ব্যালকনিতে যাওয়া ছেড়ে দিল। খোদাবক্সকে ও বারবার বলল, "দেখো, আমার অবস্থাটা একটু বিবেচনা কর। তুমি দু'দণ্ড ঘরে থাক। আমি

সারাদিন অসুস্থের মতো পড়ে থাকি।" কিন্তু খোদাবক্স সব সময়েই ওকে আশ্বাস দিয়ে বলত, আমার জান, আমি বাইরে কিছু কামানোর জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আল্লা রহম করলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই আমি এই বাধা পার হয়ে যাব।

পাঁচ মাস হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে না সুলতানা না খোদাবক্স কেউ বাধা পার হতে পারেনি।

মহরমের মাস এগিয়ে আসছিল। মহরমের সময় যে কালো কাপড় পরতে হয় তা সুলতানার কাছে ছিল না। মুখতার লেডি হেমিল্টনের এক নতুন কাটের কামিজ বানিয়ে ছিল, সেই কামিজের হাতা ছিল কালো জর্জেটের। এই কামিজের সঙ্গে ম্যাচ করার জন্যে তার কাছে কালো সাটিনের শালোয়ার ছিল। সেই শালোয়ারের রঙ ছিল কাজলের মতো চমকদার। অনবরীও রেশমী জর্জেটের একটি সুন্দর শাড়ি কিনে ছিল। সে সুলতানাকে বলে, এই শাড়ির নীচে সে সাদা বোস্কির পেটিকোট পরবে, কারণ এটাই নতুন ফ্যাশান। এই শাড়ির সঙ্গে পরার জন্যে অনবরী কালো মখমলের একজোড়া নরম জুতো কিনেছিল। এইসব জিনিস দেখে সুলতানার খুব দুঃখ হল, কারণ মহরম পালনের জন্যে এ সব কেনার কোন সামর্থ ওর ছিল না।

অনবরী এবং মুখতারের কাছে নতুন পোষাক দেখে ও যখন ঘরে ফিরে এল তখন ওর মন খুব উদাস হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল একটা ফোড়ার মতো কিছু ওর নিজের ভেতরে হয়েছে। ওর ঘর একেবারে খালি ছিল। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও খোদাবক্স বাইরে ছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ও শতরঞ্জির ওপর পাশ বালিশে মাথা রেখে শুয়ে থাকল। কিন্তু যখন ওর ঘাড় ধরে গেল তখন ও ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়াল এই দুঃখময় কল্পনাকে নিজের মন থেকে সরিয়ে ফেলার জন্যে।

সামনে রেল-লাইনের ওপর বগিগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু কোন ইঞ্জিন ছিল না। তখন সন্ধ্যার সময়। রাস্তার ওপর জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে ধুলো বসে গিয়েছিল। বাজারে লোকজনের চলাচলা শুরু হয়ে গিয়েছিল, আর যারা এদিক-সেদিক উঁকিঝুঁকি মারছিল তারা চুপচাপ

কোন ঘরে ঢুকে পড়ছিল। ঠিক এই ধরনের একজন লোক ঘাড় উঁচু করে সুলতানার দিকে তাকাল। সুলতানা মুচকি হেসে দিল। সে মুহূর্তের জন্যে খোদাবক্সের কথা ভুলে গেল, কারণ রেল-লাইনের ওপর একটা ইঞ্জিন এসে গিয়েছিল। সুলতানা ওকে খুব ভালোভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ধীরে ধীরে ওর মনে হতে লাগল ইঞ্জিনও কালো পোশাক পড়ে রয়েছে। এই অদ্ভুত ধরনের দুঃখের চিন্তা ও মন থেকে হটানোর জন্যে যখন রাস্তার দিকে তাকাল তখন দেখল সেই লোকটি গরুর গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে, যে এই কিছুক্ষণ আগে ওকে কামাতুর চোখে দেখেছিল। সুলতানা তাকে হাত নাড়িয়ে ইশারা করল। লোকটি এদিক্-ওদিক তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "কোন দিক দিয়ে আসব ?" সুলতানা তাকে ওপরে ওঠার রাস্তা দেখিয়ে দিল। লোকটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ফুর্তিবাজের মতো ওপরে উঠে এল।

সুলতানা তাকে শতরঞ্জির ওপর বসাল এবং গল্প শুরু করার জন্যে বলল, "ওপরে আসতে এত ভয় পাচ্ছিলেন কেন ?"

সুলতানার কথা শুনে লোকটি এক ঝলক মিষ্টি হাসল। হেসে বলল, "তুমি কিভাবে বুঝলে !...ভয়ের কি আছে ?"

সুলতানা তাকে বলল, "বললাম তার কারণ, আপনি অনেকক্ষণ ঐখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর কিছু চিন্তা করছিলেন।"

সুলতানার কথা শুনে সে আবার হাসল, "তুমি ভুল বুঝেছ, আমি তোমার ওপরের ফ্ল্যাটের দিকে দেখছিলাম। ঐখানে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে একজন লোককে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছিল। এই দৃশ্য আমার বেশ ভালোই লাগছিল। এর মধ্যে সবুজ বাল্ব জ্বলে উঠল তাই আমি একটু দাঁড়িয়ে গেলাম। সবুজ আলো আমি খুব ভালোবাসি। দেখতে খুব ভালো লাগে।" বলে ঘরের চারদিকে একবার সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তাকে উঠতে দেখে সুলতানা বলল, "কি, আপনি চলে যাচ্ছেন ?"

লোকটি বলল, "না, তোমাদের এই ঘরগুলো দেখতে চাই, চলো ঘুরিয়ে সব ঘর দেখাও।"

সুলতানা তাকে তিনটি ঘর এক এক করে ঘুরিয়ে দেখাল। লোকটি মুখ বুজে ঘরগুলি দেখল। তারা দু'জনে আবার আগের ঘরে যেখানে সেই

লোকটি বসে ছিল সেখানে ফিরে এল। এসে লোকটি বলল, "আমার নাম শঙ্কর।"

এই প্রথম সুলতানা শঙ্করকে খুঁটিয়ে দেখল। মাঝারি উচ্চতা। খুবেই সাধারণ চেহারা, কিন্তু ওর চোখ দুটি ছিল অসাধারণ স্বচ্ছ আর সুন্দর। আর সেই চোখে কি ধরনের যেন এক অদ্ভুত উজ্জ্বলতা ছিল। ব্যায়াম করা শক্ত সামর্থ দেহ। কানের কাছে কয়েক গোছা চুলে পাক ধরেছিল। ধূসর রঙের একটা প্যান্ট পরে ছিল। গায়ে যে সাদা সার্ট ছিল তার কলার ছিল ঘাড়ের ওপর ওঠানো।

শঙ্কর শতরঞ্জির ওপর এমন গ্যাট হয়ে বসে ছিল, যেন শঙ্কর নয় সুলতানা নিজেই তার খদ্দের। এই অনুভব সুলতানাকে বিচলিত করে তুলল। তাই সে শঙ্করকে বলল, "আদেশ করুন।"

শঙ্কর বসেই রইল। সুলতানার কথা শুনে, সে শুয়ে পড়ে বলল, "আমি কি আদেশ করব, তুমিই কর। তুমিই তো আমাকে ডেকেছ।"

সুলতানা ওর কথার কোন জবাব না দেওয়াতে সে উঠে বসল। আমি ভেবেছিলাম, "যাক তুমিই শোন। তুমি যা ভেবেছ তা ভুল। আমি সেই-সব লোকদের একজন নই যারা কিছু দিয়ে যায়। ডাক্তারের মতো আমারও ফিস আছে। আমাকে ডাকলে ফিস দিতেই হবে।"

তার কথা শুনে সুলতানার মাথা ঘুরে উঠল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও অনায়াসে হেসে উঠল, "আপনি কি কাজ করেন ?"

শঙ্কর জবাব দিল, "তোমরা যে কাজ কর সেই কাজ।"

—"কি ?"

—"তুমি কি কর ?"

—"আমি কিছুই করি না।"

— "আমিও কিছু করি না।"

সুলতানা রেগে বলল, "এটা তো ঠিক নয়……আপনি কোন না কোন কাজ নিশ্চয়ই করেন।"

শঙ্কর খুব বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল, "তুমিও নিশ্চয়ই কিছু না কিছু কর।"

—"কিছুই করি করি না।"

—"আমিও কিছু করি না।"

—"তবে এস, দু'জনে কিছু করি।"

তৈরী আছি, কিন্তু কিছু করার জন্যে আমি কখনও পয়সা দিই না।"

"নিজের বুদ্ধিকে একটু চিকিৎসা কর……এটা লঙ্গরখানা নয়।"

—"আমিও ভলেণ্টিয়ার নই।"

সুলতানা আর কথা না বাড়িয়ে থেমে গেল। ও জিজ্ঞেস করল, "ভলেণ্টিয়ার কি।"

শঙ্কর বলল, 'উল্লু কে পট্‌ঠে।"

—"আমি উল্লু কী পট্‌ঠি নই।

—"তুমি না হতে পার, কিন্তু তোমার সঙ্গে যে থাকে সেই খোদাবক্স উল্লু কা পট্‌ঠা।"

—"কেন?"

—"কেন? ও বেশ কিছুদিন ধরে এমন এক ফকিরের কাছে ওর ভাগ্য ফেরানোর জন্যে যাতায়াত করছে যার নিজের ভাগ্যই জং ধরা তালার মতো বন্ধ।" বলে শঙ্কর হেসে উঠল।

সুলতানা শঙ্করের কথা শুনে বলল, "তুমি হিন্দু, তাই আমাদের এই ফকিরকে নিয়ে ঠাট্টা করছ।"

শঙ্কর বলল, "বেশ্যাখানায় হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন ওঠানো উচিত নয়। বড় বড় পণ্ডিত এবং মৌলভীরাও এখানে এসে ভদ্রলোক বনে যায়।"

—"কি উটপটাং কথা বলছ, থাকবে কিনা বল?"

—"থাকব, ঐ শর্তে যা তোমাকে আগে বলেছি।"

সুলতানা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "যাও, নিজের রাস্তা ধর।"

শঙ্কর হেলে দুলে উঠে দাঁড়াল। প্যাণ্টের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে যেতে যেতে বলল, "আমিও মাঝে মাঝে এই বাজার দিয়ে যাতায়াত করি। তোমার যদি কখনও কোন দরকার হয়, তবে ডাকবে…আমি খুব কাজের লোক।"

শঙ্কর চলে গেল। সুলতানা কালো পোশাকের কথা ভুলে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে শুধু ওর কথাই ভাবতে লাগল। এই মানুষটির কথাবার্তা তার দুঃখকে অনেকখানি হাল্কা করে দিয়েছিল। যদি সে আম্বালায় আসত, যেখানে ও সুখে ছিল, সেখানে সুলতানা তাকে অন্য চোখে দেখত এবং খুব সম্ভবত তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত। কিন্তু এখানে ও উদাস হয়ে দিন কাটায়, তাই শঙ্করের কথা ওর খুব ভালো লাগল।

সন্ধ্যার সময় যখন খোদাবক্স এল তখন সুলতানা তাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আজ সারা দিন কোথায় উধাও হয়ে ছিলে ?"

খোদাবক্স ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছিল। বলল, "পুরনো কেল্লা থেকে আসছি। সেখানে একজন ফকির কিছুদিন হল এসে রয়েছেন তার কাছেই প্রতিদিন যাই যাতে আমাদের দিন ফেরে।"

—"সে তোমাকে কিছু বলেছে ?"

—"না, এখনও সে মেহেরবান হয়নি। সুলতানা, আমি যেভাবে তার খিদমত করছি, তা কখনও বৃথা যাবে না। আল্লার যদি কৃপা থাকে তবে নিশ্চয় দিন ফিরবে।"

সুলতানার মহরম পালনের কথা মনে পড়ে গেল। খোদাবক্সকে ও অশ্রু-ভরা সিক্ত কণ্ঠে বলল, "সারাদিন তুমি বাইরে বাইরে থাক। আর আমি এখানে খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকি। না কোথাও যেতে পারি, না আসতে পারি। মহরম মাথার ওপর এসে গিয়েছে। তুমি এর কোন ব্যবস্থা কর। কালকে আমার কাপড় চাই। ঘরে এক কানা কড়িও নেই। কঙ্কনগুলি ছিল, তাও এক এক করে গিয়েছে। তুমিই বল কি হবে ? ......ফকিরের পিছে আর কতদিন ঘুরে বেড়াবে। আমার মনে হচ্ছে দিল্লিতে খোদা আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমার কথা যদি শুনতে চাও তবে নিজের কাজ শুরু করে দাও। তাতে কিছু সুরাহাই হবে।"

খোদাবক্স শতরঞ্জির ওপর শুয়ে পড়ে বলল, "কাজ শুরু করার জন্যেও তো সামান্য কিছু পুঁজি চাই। ......খোদার নামে, এখন এ রকম দুঃখজনক কথা বল না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। সত্যি সত্যি আম্বালা ছেড়ে মস্ত ভুল করেছি। কিন্তু যা ঘটে তা আল্লাই ঘটান, তিনি আমাদের ভালোর জন্যেই করেন। জানি না, আর কতদিন কষ্ট সহ্য করার পর আমরা..."

সুলতানা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "খোদার নামে কসম, তুমি কিছু কর। চুরি করে হোক ডাকাতি করে হোক আমাকে শালোয়ারের কাপড় এনে দাও। আমার কাছে সাদা বোস্কির কামিজের কাপড় আছে, তা আমি রঙ করিয়ে নেব। সাদা শিফনের একটা ওড়না আছে দেওয়ালির সময় তুমি আমাকে দিয়েছিলে। কামিজের সঙ্গে সেটাও আমি রঙ করে নেব। শুধু একটা শালোয়ার দরকার, তুমি যেমন করে পার তা জোগাড় করে দাও।

…আমার জানের কসম, যেমন করে পার এনে দাও। না এনে দিলে আমার শ্রাদ্ধ খাও।"

খোদাবক্স উঠে বলল, "তুমি শুধু কসম দিয়েই চলেছ। ‥বল আমি কোথা থেকে আনব…আফিম খাওয়ার জন্যে আমার কাছে একটি পয়সাও নেই।"

—"যেমন করে পার আমাকে সাড়ে চারগজ কালো সাটিন এনে দাও।"

—"প্রার্থনা কর, আজ রাত্রে যেন আল্লা দু-তিন জনকে পাঠিয়ে দেন।"

—"তুমি কিছু করবে না।…তুমি ইচ্ছে করলে এ কটা পয়সা নিশ্চয়ই জোগাড় করতে পার। যুদ্ধের আগে এই সাটিনের গজ ছিল বারো থেকে চোদ্দ আনা। [illegible] এক গজের দাম পাঁচশিকে। সাড়ে চার গজে কত টাকা লাগবে?"

—"তুমি যখন বলছ, আমি কিছু একটা ব্যবস্থা করব।" বলে খোদাবক্স উঠে দাঁড়াল। "নাও, এখন এসব ভুলে যাও। আমি হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসি।"

হোটেল থেকে খাবার এল। খেয়ে-দেয়ে দু'জনে শুয়ে পড়ল।

ভোরে খোদাবক্স পুরনো কেল্লার ফকিরের কাছে গেল, আর সুলতানা একলাই রইল। কিছুক্ষণ শুয়ে এবং ঘুমিয়ে কাটাল, তারপর ও সাদা শিফনের ওড়না এবং সাদা বোস্কির কামিজ বের করল এবং নীচে লণ্ড্রিতে রঙ করতে দিয়ে দিল। কাপড় ধোয়া ছাড়াও সেখানে রঙ করার কাজও হত। লণ্ড্রিতে রঙ করতে দিয়ে ও ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়তে লাগত। ম্যাগাজিনে ফিল্মের গল্প এবং গান দু-ই ছিল। ম্যাগাজিন পড়তে পড়তে ও ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল তখন চারটে বেজে গিয়েছিল, কারণ রৌদ্র তখন নর্দমার কাছে সরে গিয়েছিল। স্নান-টান করে যখন ও দেখল হাতে কোন কাজ-কর্ম নেই তখন ও গরম চাদর গায়ে জড়িয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। প্রায় ঘণ্টা খানেক ও ব্যালকনিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। আলো জ্বলে উঠছিল। নীচের রাস্তায় ঝলমল আলোর রশ্মি চোখে এসে লাগছিল। শীতের ভাবটা একটু তীব্র হয়ে উঠল, এই তীব্রতা সুলতানা ভালোই লাগল। চলন্ত টাঙ্গা আর মটোরগুলোকে অনেক অনেকক্ষণ ধরে ও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ ও শঙ্করকে দেখতে পেল। বাড়ির নীচে এসে সে ঘাড় উঁচু করে সুলতানার দিকে তাকিয়ে হেসেদিল।

সুলতানা বিনা দ্বিধায় তাকে ওপরে আসার জন্যে ডাকল।

শঙ্কর যখন ওপরে এল তখন সুলতানা খুব বিব্রত বোধ করল, কারণ শঙ্করকে সে কি বলবে। ও কোন চিন্তা ভাবনা না করেই তাকে ডেকেছিল। শঙ্করের মধ্যে এমন কোন একটা স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক ভাব ছিল যেন এটা তার নিজের ঘর। প্রথম দিনের মতো আজকেও সে পাশ বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। সুলতানা যখন তার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কোন কথাই বলল না, তখন সে নিজেই বলল, "তুমি আমাকে শ'বার ডাকতে পার আবার শ'বার চলে যেতে বলতে পার।...এই ধরনের কথায় আমি কখনও অসন্তুষ্ট হই না।"

সুলতানা খুব টালমাটালে পড়ে গেল। বলল, "না বসো, তোমাকে যেতে কে বলছে।"

ওর কথায় শঙ্কর হেসে উঠল। বলল, "আমার শর্তে তুমি রাজী?"

—"কি শর্ত?" সুলতানা হেসে জিজ্ঞেস করল, "কেন আমাকে নিকা করছ নাকি?"

—"নিকা বিয়ে, কেন?"......না তুমি নিকা করে সারা জীবন কারো সঙ্গে থাকবে, না আমি ...এ সুখ আমাদের জন্যে নয়...ছেড়ে দাও এই অসম্ভব ব্যাপার, কোন কাজের কথা বল।"

—"বলো" কি কথা বলব?"

—"তুমি মেয়ে মানুষ, এমন কথা বলো যাতে দিল বদলে যায়। এই দুনিয়াতে শুধু দোকানদারি নেই, অন্য আরও কিছু আছে।"

সুলতানা মনে মনে শঙ্করকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। বলল, "খোলসা করে বলো, তুমি আমার কাছে কি চাও?"

—"অন্যে যা চায় তাই-ই চাই।" বলে শঙ্কর উঠে বসল।

—"তবে তোমার সঙ্গে অন্যের পার্থক্য কোথায় রইল?"

—"তোমার আর আমার মধ্যে কোন ফারাক নেই। ওদের সঙ্গে আমার আসমান আর জমিনের পার্থক্য। এমন অনেক কথা আছে, যা জিজ্ঞেস করা যায় না—বুঝতে হয়।"

সুলতানা বেশ কিছুক্ষণ ধরে শঙ্করের এই কথার মানে অনুভব করার চেষ্টা করল। তারপর বলল' "আমি বুঝতে পেরেছি।"

—"তবে বলো, তুমি কি বলতে চাও?"

—"তুমি জিতে গিয়েছ, আমি হেরে গিয়েছি। কিন্তু আমি বলছি, আজ পর্যন্ত কেউ এমন কথা আমার কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি।"

—"তুমি ভুল বলছ।…এই মহল্লায় খুঁজলেই তুমি এমন অনেক সহজ-সরল আর সাদাসিধে মেয়ে মানুষ হয়তো পাবে যারা বিশ্বাসই করতে পারবে না কোন মেয়ে তার পরাজয় এমনভাবে স্বীকার করতে পারে। আর যে পরাজয় তুমি বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিচ্ছ তারা তা মুখে স্বীকার না করলেও, তোমার এই সত্য হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে আছে। তোমার নাম সুলতান না?"

—"হ্যাঁ সুলতান।"

শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। তারপর হেসে বলল, "অমোর নাম শঙ্কর… আমার এই নামও এক অদ্ভুত—উটপটাং। যাক, চল, ভেতরে চল।"

শঙ্কর এবং সুলতানা যে ঘরে শতরঞ্চি বিছানো ছিল সে ঘর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। কি কথায় তারা হাসছিল তা কে জানে! কিন্তু শঙ্কর যখন চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল তখন সুলতান তাকে বলল, "শঙ্কর আমার একটা কথা রাখবে?"

শঙ্কর বলল, "আগে বল, তারপর।"

সুলতানা কিছুটা দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল, "তুমি হয়তো বলবে আমি দাম উশুল করতে চাইছি, কিন্তু…"

—বল, বলে ফেল…থামলে কেন?"

সুলতানা সাহস সঞ্চয় করে বলল, "এমন কোন কথা নয়, মহরম আসছে, আমার কাছে এত পয়সা নেই যে কালো শালোয়ার বানাই। আমার এখান-কার সমস্ত দুঃখের কথাতো তুমি শুনেছ। আমার কাছে যে কামিজ আর ওড়না ছিল তা আমি রঙ করতে দিয়ে এসেছি।"

শঙ্কর ওর কথা শুনে বলল, "তুমি চাও আমি তোমাকে কিছু টাকা দেই, আর সেই টাকা দিয়ে তুমি শালোয়ার তৈরী করাও।"

সুলতানা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, "না, আমি তা বলছি না, আমি বলছি যদি সম্ভব হয় তুমি আমাকে একটা শালোয়ার এনে দাও।"

শঙ্কর হাসল, "আমার পকেটে সংযোগ থেকেই কিছু সৃষ্টি হয়। তবু

আমি চেষ্টা করব। মহরমের প্রথম দিনেই তুমি শালোয়ার পেয়ে যাবে। এখন খুশী তো?" তারপর সুলতানার কানের দুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই দুল জোড়া তুমি আমাকে দেবে?"

সুলতানা হেসে বলল, "এ তুমি কি করবে? রুপোর সাধারণ দুল। খুব বেশী হলে পাঁচ টাকা দাম হবে।"

শঙ্কর বলল, "আমি তোমার কাছে দুল চেয়েছি, এর দাম জিজ্ঞেস করিনি। বল, দেবে কিনা?"

"নিয়ে যাও।" বলে সুলতানা দুল খুলে শঙ্করকে দিয়ে দিল। দিয়ে ওর আফসোস হল, কিন্তু শঙ্কর তখন চলে গিয়েছিল।

সুলতানা একেবারেই বিশ্বাস করতে পারেনি শঙ্কর তার কথা রাখবে। কিন্তু আট দিন পর, মহরমের প্রথম দিন সকাল ন'টায় ওর ঘরের দরজা কেউ খটখটাল। সুলতানা দরজা খুলে দেখল শঙ্কর দাঁড়িয়ে আছে। খবরের কাগজে মোড়া একটা জিনিস সুলতানার হাতে দিয়ে বলল, "সাটিনের কালো শালোয়ার আছে···দেখে নিও, খুব সম্ভব লম্বা হবে···আমি এখন যাচ্ছি।"

শঙ্কর শালোয়ার দিয়ে চলে গেল। সুলতানার সঙ্গে আর বেশী কোন কথা বলল না। ওর প্যাণ্টে ক্রিজ পড়ে গিয়েছিল। চুল উস্কো-খুস্কো। দেখে মনে হচ্ছিল এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে সোজা এখানে এসেছে।

সুলতানা কাগজের মোড়ক খুলল। খুলে দেখল সাটিনের কালো শালোয়ার। মুখতারের কাছে যেমন শালোয়ার দেখেছিল হুবহু তেমনি। সুলতানা খুব খুশী হল। দুল আর সেই সওদার জন্যে ওর যে আফসোস ছিল তা দূরে হয়ে গেল এই শালোয়ার এবং শঙ্করের ওয়াদা রাখার জন্যে।

দুপুরে ও নীচের লণ্ড্রি থেকে রঙ করানো কামিজ এবং ওড়না নিয়ে এল। শালোয়ার কামিজ এবং ওড়না যখন ও পরে নিল তখন দরজার কড়া ধরে কেউ নাড়ল। সুলতানা দরজা খুললে মুখতার ভেতরে এল। সে সুলতানার দিকে তাকিয়ে বলল, "কামিজ আর ওড়না তো দেখছি রঙ করা হয়েছে, কিন্তু এই শালোয়ার তো নতুন।······কবে তৈরী করিয়েছ?"

সুলতানা বলল, "আজ দর্জি দিয়ে গিয়েছে।" বলতে বলতে ওর চোখ মুখতারের কানের ওপর পড়ল—"এই দুল তুমি কোত্থেকে নিয়েছ?"

মুখতার বলল, "আজকেই আনিয়েছি।"

এরপর দু'জনেই কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না।

ইদন

ইদন বাঈ আগরাওয়ালীর জন্ম ছোট ইদের দিন। আর তাই ওর মা জোহরা জান ওর নাম রাখে ইদন। তার কালে জোহরা জান খুব নামকরা গাইয়ে ছিল। বহু দূর দূর থেকে পয়সাওয়ালা লোকরা তার মজুরা শুনতে আসত।

গল্প আছে মিরাটের, এক লাখোপতি, তাজব আব্দুলাহ-এর প্রেমে জোহরা জান মশগুল হয়ে যায়। তাকে ভালোবেসে জোহরা জান তার নিজের পেশা পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। এতে আব্দুল্লাহ ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়ে। ওর জন্যে তিনশ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেয়। সে সপ্তাহে তিন দিন ওর কাছে আসত। সারারাত জোহরার সঙ্গে কাটাত, আর ভোর হতে না হতেই চলে যেত।

আগরায় যারা থাকে, তারা প্রায় সবাই জানে, জোহরা জানকে সত্যি সত্যি যে হৃদয় দিয়ে চাইত, সে ছিল এক সুতোরমিস্ত্রি। কিন্তু জোহরা জান তার দিকে ফিরেও তাকাত না। ওর যা প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করত সুতোরমিস্ত্রি। তিন-চার মাস ধরে পরিশ্রম করে যে টাকা জমত, সেই টাকা নিয়ে সে জোহরা জানের কাছে আসত। কিন্তু জোহরা জান তাকে কোন রকম পাত্তাই দিত না।

অবশেষে একদিন সুতোরমিস্ত্রি জোহরা জানের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলার সুযোগ পেল। তখন ওর সারা চোখে-মুখে ভালোবাসার এক পাগলপন সৌন্দর্য ছেয়েছিল। তাই সে প্রথমে একটি কথাও বলতে পারল না। কিন্তু একটু পরে সে সাহস সঞ্চয় করে বলল, "জোহরা জান, আমি খুবই গরীব, জানি, তোমার কাছে এক থেকে এক ধনী শেঠরা আসে···আর তোমার প্রতিটি ঠমকের জন্য তারা হাজার হাজার টাকা দু' হাতে উজাড় করে ঢেলে দেয়। কিন্তু তুমি হয়তো জানো না, গরীব মানুষের ভালোবাসা,—যাদের ধনদৌলত আছে, তাদের চেয়ে অনেক বড়, অনেক মহান। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি নিশ্চয়ই তা জানো··· ।"

ওর কথায় জোহরা জান বিদ্রূপভরে হো হো করে হেসে উঠল। ওর হাসি দেখে সুতোরমিস্ত্রির হৃদয় ভেঙে খান খান হয়ে গেল। "তুমি হাসছ ?

আমার ভালোবাসাকে তুমি ব্যঙ্গ করছ? আমি গরীব,—কাঠ চেরাই করে জীবন চালাই বলে? জোহরা জান, শোন, অজস্র মানুষ, যারা তোমাকে নিয়ে খেলা করছে, আমার হৃদয় তোমার জন্যে যে ভালোবাসা আছে, সে ভালোবাসা তারা তোমাকে দিতে পারবে না।"

ওর কথায় জোহরা জান বিরক্ত বোধ করল। সে তার পাহারাদার লোকটিকে বলল, সুতোরমিস্ত্রিকে ঘর থেকে বের করে দিতে। কিন্তু তার আগেই সুতোরমিস্ত্রি বেরিয়ে গেল।

এই ঘটনার ঠিক এক বছর পর ইদনের জন্ম হয়। ওর বাবা আব্দুল্লাহ, না অন্য কেউ, তা হলফ করে বলা খুবই কঠিন। নিন্দুকেরা বলত, ইদন হচ্ছে গাজিয়াবাদের এক হিন্দু শেঠের মেয়ে। যারই ঔরসে ওর জন্ম হোক না কেন, ওর সৌন্দর্যের কোন তুলনাই হয় না।

এদিকে জোহরা জানের বয়স ঢলে পড়ছিল, আর ইদন ক্রমেই যৌবনের দিকে পা বাড়াচ্ছিল। ওর মা ওকে গান বাজনায় খুব ভালো করে তালিম দিতে লাগল! মেয়েও ছিল তেমনি তুখোড়। বেশ কয়েকজন ওস্তাদের কাছ থেকে ও শিক্ষা নিল। আর তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই ও বাহবা কুড়োল।

জোহরা জানের বয়স এখন চল্লিশ ছুই ছুই করছে। একজন বেশ্যার যে পথ অতিক্রম করার পর দেহে আর সামান্য শক্তি অবশিষ্ট থাকে, ও সেসব পথ অতিক্রম করে এসেছে। এখনও ওর একমাত্র মেয়ে ইদনকে আশ্রয় করেই বেঁচে আছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ইদনের মুজরা হয়নি। ওর ইচ্ছে, এই মুজরা উপলক্ষে এক বিরাট সমারোহের আয়োজন করবে। আর সে সমারোহ উদ্বোধন করবে কোন রাজা-মহারাজা বা নবাব।

ইদনের সৌন্দর্য নিয়ে চারদিকেই চর্চা হত। বহু দূর দূরান্তের ধনী ব্যক্তিরা জোহরা জানের কাছে তাদের দালাল পাঠাত। তার 'নথ-খোলার' অনুমতি চেয়ে উপহার পাঠাত। কিন্তু ওর এত তাড়াহুড়া ছিল না। ওর ইচ্ছে 'নথ-খোলার' উৎসব বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে হোক। আর যাতে ও একটা বেশ বড় রকমের দাও মারতে পারে। ওর মেয়েও দেখতে লাগে এক। সমস্ত এলাকায় ওর মতো আর দ্বিতীয় সুন্দরী ছিল না।

ওর সৌন্দর্য মানুষকে কীভাবে অভিভূত করে, তা দেখার জন্যে প্রতি

শুক্রবার সন্ধ্যায় ও ইদনকে নিয়ে বেড়াতে বের হত। যে সব পুরুষরা প্রেম করতে ভালোবাসে, ওকে দেখলেই তাদের হৃদয় ধড়াক করে উঠত।

একদিন সত্যি সত্যি জোহরা জানের সে ইচ্ছা পূর্ণ হল। একজন নবাব ইদনকে পাওয়ার জন্যে জান কবুল করে দিল। সে ইদনের জন্যে যে কোন দাম দিতে প্রস্তুত ছিল। জোহরা জান তাই এই আনন্দে এক সুন্দর ভব্য সমারোহের আয়োজন করল। তাদের কাছে এ ছিল এক বিরাট উৎসব।

সন্ধ্যার সময় নবাব তার নিজের টাঙ্গায় করে এল। জোহরা জান তাকে বিরাট সম্বর্ধনা জানাল। নবাব সাহেবের খুশী হল। ইদন কনে সেজে ছিল। নবাব সাহেবের ইচ্ছা মুতাবিক ইদনের মুজরা শুরু হল।

সেদিন সন্ধ্যায় ইদনকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। ওর প্রতিটি কুর্ণিশ প্রতিটি চলন প্রতিটি ঢং আর গান এক আশ্চর্য অনুভূতি সৃষ্টি করছিল। নবাব সাহেব পাশ বালিশে হেলান দিয়ে বসে ছিল। নবাব সাহেবের মনে হচ্ছিল, আজকে রাত্রে সে স্বর্গে বিচরণ করবে। কার ভাগ্যে এমন সুখ জোটে!

সে যখন এসব ভাবছিল, ঠিক তখন হঠাৎই, এই সমারোহে একেবারে বেমানান একজন ঘরে ঢুকল। ঢুকে জোহরা জানের পাশে বসল। ওকে দেখে জোহরা জান ঘাবড়ে গেল। লোকটি ছিল সেই সুতোরমিস্ত্রি। ওর প্রেমিক। ওর পরনে ছিল দুর্গন্ধময় জামা-কাপড়। ওকে দেখে নবাব সাহেবের গা গুলিয়ে উঠল। সে জোহরা জানকে বলল, "এই বেয়াদপটি কে?"

সুতোরমিস্ত্রি মুচকি হেসে বলল, "হুজুর, আমি এর প্রেমিক।"

সুতোরমিস্ত্রি তার থলি থেকে করাত বের করল। তারপর বেশ জোর করে জোহরা জানকে চেপে ধরে ওর ঘাড়ের ওপর করাত চালাতে লাগল। নবাব সাহেব এবং জোহরা জানের পাহারাদার লোকটি এই বীভৎস কাণ্ড দেখে ভয়ে পালাল। ইদন অজ্ঞান হয়ে পড়ল।...সুতোরমিস্ত্রি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তার কাজ সারল। রক্তমাখা করাতটা সে তার থলেতে ভরে সোজা থানায় হাজির হল। নিজের অপরাধ কবুল করল। শোনা যায় তাঁর যাবজ্জীবন সাজা হয়েছিল।

নথ-খোলা—বেশ্যাদের নাকের নথ যে খুলবে, সেই প্রথম কুমারীত্ব ভাঙবে।

মার এই হত্যা, ইদনের মনের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করল যে, ও প্রায় দু'-আড়াই মাস অসুস্থ হয়ে পড়ে রইল। হাসপাতালে ওর খোঁজখবর, দেখা-শোনা ওর ওস্তাদ এবং পাহারাদার লোকটিই করে। নবাব আর পয়সাওয়ালা লোকরা যারা ওর জন্যে জান কবুল করে দিয়েছিল, তারা ওকে ভুলেও দেখতে যায়নি। ও কেমন উদাস হয়ে রইল। শরীর একটু ভালো হলে ও আগরা থেকে দিল্লি চলে এল। ওর দেহ এবং মন দু-ই এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে, ও মুজরা করতে চাইল না। ওর কাছে হাজার বিশ-পঁচিশ টাকার অলংকার ছিল। এর অর্ধেকটাই ছিল ওর মৃত মা জোহরা জানের। এই অলংকার বিক্রি করে ও ওর দিন গুজরান করতে লাগল।

সেসময়ে পাকিস্তানের জন্যে জোরদার আন্দোলন চলছিল। ইদন একদিন রেডিওতে শুনল, হিন্দুস্তান দু' টুকরো হয়ে গিয়েছে। এর পরেই দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে মারতে লাগল। এ ছিল এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। রক্ত যেন জলের চেয়েও সস্তা হয়ে গেল।

মুসলমানরা স্রোতের মতো পাকিস্তানের দিকে রওনা হল। ইদন ঠিক করল সে আর দিল্লিতে থাকবে না। লাহোরে চলে যাবে। অনেক কষ্টে সে তার অবশিষ্ট যৎসামান্য গয়নাগাটি বিক্রি করে লাহোরে এল। ওর কাছে যে দামী দামী জিনিস এবং সামান্য গয়না ছিল, তা পথেই ওর মুসলমান ভাইরা লুট করে নিল। ও যখন লাহোরে পৌঁছুল, তখন ও একেবারে নিঃস্ব। কিন্তু ওর সৌন্দর্য তেমনি অটুট ছিল। দিল্লি থেকে লাহোরে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই হাজার হাজার মানুষ ওর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিন্তু ও ভাবল, জীবন কীভাবে নির্বাহ করবে? চানা বিক্রি করার মতো দু'টো কানাকড়িও ওর কাছে নেই। ইদন ছিল বুদ্ধিমতি। সে সোজা সেই জায়গায় গিয়ে উঠল, যেখানে তার মতো মেয়েরা দেহ বেঁচে জীবিকা চালায়। সেখানে সবাই তাকে স্বাগত জানাল।

সেই সময় লাহোরে পয়সার ছড়াছড়ি। হিন্দুরা যা ফেলে গিয়েছিল তা এখন মুসলমানদের। হীরামণ্ডির জৌলুসও খুলে গিয়েছে।

ইদনকে যারা দেখল তারা তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল। সারা রাত ধরে অসংখ্য গান গেয়ে সে তাদের আবেদন-নিবেদন পূরণ করতে লাগল।

এই ভাবে বছর দেড়েক কেটে গেল। এরপর সে আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে গানের মহফিল শুরু করল।

নিজস্ব ঘর থাকার জন্য ওর আমদানীও বেড়ে গেল। সব রকম সুখ-সুবিধাই এখন ও ইচ্ছে করলে পেত। দু-চারটে গয়নাও ও বানাল। ভালো ভালো জামা-কাপড়ও ও তৈরি করে নিল।

এই সময়েই, একজনের সঙ্গে ওর পরিচয় হল। সে ছিল কালোবাজারের বাদশা। লোকটি কম করে হলেও দু'কোটি টাকা কামিয়ে নিয়েছিল। দেখতেও ছিল সুপুরুষ। প্রথম যে দিন ও ইদনকে দেখে, সেদিনই ওর সৌন্দর্যে ও এমন অভিভূত হয়ে পড়ে যে, ওর হুড-খোলা সাদা পেকার্ড গাড়িটা ওকে উপহার দেয়। প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় ও ইদনের কাছে আসতে লাগল আর দু শ' থেকে আড়াই শ' টাকা ওকে নজরয়ানা দিয়ে যেতে লাগল। একদিন সন্ধ্যার সময় ও ইদনের কাছে এল। ইদনের ফরাস ছিল নোংরা। সে ইদনকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার চাদর এত নোংরা কেন?"

ইদন কুর্ণিশ করার ভঙ্গিতে বলল, "আজকাল আর মার্কিনের থান কোথায় পাওয়া যায়?"

পরের দিনই বাদশা চল্লিশ থান মার্কিন কাপড় ইদনের কাছে পাঠিয়ে দিল। এর তিন দিন পর ইদন আড়াই হাজার টাকা খরচ করে তার ঘর সাজানোর আসবাবপত্র কিনে আনল।

ইদন ভালো এবং মোলায়েম মাংস খুব পছন্দ করত। ও যখন আগরা এবং দিল্লিতে থাকত, সেখানে ও ওর মনের মতো ভালো মাংস পেত না। কিন্তু লাহোরের কাদরা কসাই ওকে ভালো মাংস দিয়ে যেত। আঁশহীন মাংস। মাংসের প্রতিটি টুকরো এমন নরম, মনে হত যেন রেশম দিয়ে তৈরি।

দোকানে চেলাকে বসিয়ে রেখে কাদরা ভোর-ভোর ইদনের কাছে আসত। আর ইদনকে দেড় সের মাংস দিয়ে যেত। মাংস দিতে এসে কাদরা অনেকক্ষণ ধরে ওর সঙ্গে গল্প-গুজব করত। আর সে গল্প সাধারণত মাংস নিয়েই হত।

কালোবাজারের বাদশা জাফর শাহ ইদনের প্রেমে ভীষণভাবে ডুবে গিয়ে ছিল। একদিন সন্ধ্যায় সে ইদনকে বলল, ইদন যদি তাকে বিয়ে করে, তবে

সে তার সমস্ত সম্পত্তি ইদনকে দিয়ে দিবে। কিন্তু ইদন ওর প্রস্তাবে রাজি হল না। জাফর শাহ উদাস হয়ে গেল। ও বেশ কয়েকবার চেষ্টা করল, ইদন যাতে ওর একান্ত হয়। কিন্তু প্রতিবারই ও বিফল হল। মুজরা শেষ হওয়ার পর, রাত্রি প্রায় দুটো-তিনটের সময় ইদন বেরিয়ে পড়ত। কোথায় যেত কে জানে?

একদিন রাত্রে মদের নেশায় ভুল করে জাফর শাহ হেঁটে ফিরছিল। হঠাৎই সে দেখল, 'সাই কে তকিয়ের' বাইরে ইদন খুবই সাধারণ কুসিৎ একজন লোকের পা জড়িয়ে ধরে বলছে, "খোদার কসম, তুমি আমার প্রতি মেহেরবান হও। আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালোবাসি। তুমি এমন হৃদয়-হীন—এমন জালিম কেন?"

জাফর শাহ ভালো করে সেই লোকটির দিকে তাকাল। দেখল লোকটি কাদরা কসাই। কাদরা কসাই বেশ বিরক্তির সঙ্গে ইদনকে বলছে, "যা যা··· আমি আজ পর্যন্ত কোন খারাপ মেয়ের দিকে তাকাইনি। আমাকে জ্বালাস না···"

কাদরা ওকে পা দিয়ে ঠোকর মারছিল—আর ইদন যেন সেই ঠোকর খেয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করছিল।

অর্ধেক নারী

জুবেদার যখন বিয়ে হয় তখন ওর বয়স পঁচিশ বছর। ওর বাবা-মার ইচ্ছে ছিল সতেরো বছর বয়সেই ওকে বিয়ে দেয়। কিন্তু মনের মতো তেমন কোন সম্বন্ধ আসেনি। যখনই ওর বিয়ের কথা প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে, তখনই কোন না কোন সমস্যা হাজির হয়েছে। ফলে তা আর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়নি।

যখন জুবেদা পঁচিশ বছরে পা দিল, তখন ওর বাবা এক বিধুর ব্যক্তির সঙ্গে ওর সম্বন্ধ-ঠিক করে ফেলল।

জুবেদা ছিল ওর বাবা-মার খুব বাধ্য মেয়ে। ও নিজেই এই ফরসালা মেনে নেয় বলে বিয়ে হয়; এবং জবেদা শ্বশুর বাড়ি চলে যায়।

ওর স্বামীর নাম ইলমুদ্দিন। খুবই সৎপ্রকৃতির মানুষ, এবং স্বামী হিসেবে প্রেম কীভাবে করতে হয় তা সে জানত। জুবেদার সুখ-দুঃখের প্রতি নজর রাখত।

প্রতিমাসেই একবার করে জুবেদা তার বাবা-মার কাছে যেত। একদিন সে যখন বাবার বাড়ি গেল এবং সদর দরজায় পা রাখতে না রাখতেই বাড়ির ভেতর কান্নার রোল উঠল, বাড়ির ভেতর ঢুকতেই ও বুঝতে পারল, ওর বাবা হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে।

জুবেদার মা এখন বাড়িতে একলাই থাকে। বাড়িতে চাকর-বাকর ছাড়া আর অন্য কেউ ছিল না। তাই সে তার স্বামীকে বলল, সে যদি অনুমতি দেয় তবে সে তার বিধবা মাকে এখানে নিয়ে আসবে।

ইলমুদ্দিন জুবেদাকে বলল, "এতে অনুমতি নেয়ার কি আছে? এতো তোমার নিজের বাড়ি, তোমার মা আমারও মা। গিয়ে উনাকে নিয়ে এস। উনার জিনিসপত্র আনার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।"

জুবেদা খুব খুশী। বাড়িও বিশাল। দু-তিনটে ঘর খালিই পড়েছিল। ও টাঙ্গায় গেল, সঙ্গে মাকে নিয়ে ফিরে এল।

একদিন ওর মা ওকে বলল, আমি এখানে দশ মাস হতে চলল এসেছি। একটি পয়সাও খরচ করিনি। তোর বাবা দশ হাজার টাকা আর গয়না রেখে গিয়েছে।"

জুবেদা উনুনে পাতলা পতলা রুটি সেঁকছিল। বলল, "মা, তুমি কি বলছ!"

"কি এবং কেন টেন আমি বুঝি না…আমি সব কিছুই ইলমুদ্দিনকেই দিয়ে দিতাম, কিন্তু আমার ইচ্ছে, তোর কোন বাচ্চা হলে তাকেই আশীর্বাদে সব দেব।"

জুবেদার মার একটি কথা বারবার মনে হয় ওর কেন বাচ্চা-কাচ্চা হচ্ছে না। বিয়েও তো প্রায় দু'বছর হল হয়েছে। কিন্তু বাচ্চা-কাচ্চা হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

ওর মা ওকে হেকিমের কাছে নিয়ে গেল। কত রকম পাউডার, কত রকম ওষুধ ওকে খাওয়াল। কিন্তু তাতেও কোন কিছু হল না।

অবশেষে সে জুবেদাকে পীর-ফকিরের কাছে নিয়ে গেল। কতরকম টোটকা হল। তাবিজ পরাল। কিন্তু তা সত্বেও তার মনস্কামনা পূরণ হল না।

টোটকা-টুটকি করতে করতে জুবেদার এসবের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মাল। একদিন সে ভীষণ চটে গিয়ে তার মাকে বলল, "মা এসব নিয়ে আর মাথা ঘামিও না, বাচ্চা না হয় নাই হবে।"

ওর মা ঠোঁট উলটে বলল, "মা, তুই জানিস না, কেন একটা মেয়ের বাচ্চ-কাচ্চা দরকার। তোর মাথাটাথা কি খারাপ হয়ে গিয়েছে? বাচ্চা-কাচ্চা হলে মানুষের জীবনের বাগিচা পল্লবিত হয়ে ওঠে। তা হলে…"

জুবেদা ফুলকো রুটি বাটিতে রাখতে রাখতে বলল, "মা, বাচ্চা যদি না হয় তবে আমি কি করতে পারি? একি আমার অপরাধ?"

ওর বৃদ্ধা মা বলল, "এ অপরাধ কারও নয়।…শুধু আল্লাহতাল্লার মেহেরবানী দরকার।"

জুবেদা শুধু খোদাতাল্লার সেবাযত্নই করেনি। অজস্রবার তাঁর কাছে প্রার্থনাও করেছে। খোদা যেন তাকে কৃপা করে, তার কোলে সন্তান দেয়। কিন্তু ওর এত প্রার্থনাতেও কোন কিছু হয়নি।

ওর মা প্রতিদিন যখন ওর সঙ্গে বাচ্চার জন্ম নিয়ে কথা বলত, তখন ওর মনে হত, ও এক অনাবদী জমি; যে জমিতে কোন গাছ-গাছালি কোনদিন অঙ্কুরিত হবে না।

রাত্রে জুবেদা অদ্ভুত ধরনের সব স্বপ্ন দেখত। প্রতিটি স্বপ্নের

দুশ্যই ছিল আবোল-তাবোল।….কখনও দেখত, ও জনমানব শূন্য মরুভূমিতে একাকী দাঁড়িয়ে আছে। ওর কোলে এক হৃষ্টপুষ্ট শিশু। ও সেই শিশুকে নিয়ে এমন ভাবে শূন্যে ছুঁড়ে দিল যে, শিশুটি আকাশে পেঁছে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

কখনও বা ও স্বপ্নে দেখে, ও এমন এক বিছানায় শুয়ে আছে, যে বিছানা ছোট ছোট শিশুদের জীবন্ত এবং স্পন্দিত মাংস দিয়ে তৈরি।

এসব স্বপ্ন দেখতে দেখতে ও ওর চিন্ত-ভাবনার ভারসাম্য খুইয়ে বসল। ও যখন বসে থাকত, সর্বক্ষণ শুধু বাচ্চাদের কান্না ওর কানে এসে বাজত। একদিন সে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, "এ কার বাচ্চা কাঁদছে মা ?"

ওর মা কান খাড়া করে কান্নার আওয়াজ শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন রকম কোন কান্নার আওয়াজ শুনতে না পেয়ে বলল, "কোথায় ? কোন বাচ্চা তো কাঁদছে না।"

'না মা, কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে নেতিয়ে পড়ছে।"

ওর মা ওকে বলল, "হয় আমি কানে কম শুনছি, আর না হয় তোর কানে কিছু হয়েছে।"

জুবেদা আর কোন কথা না বলে চুপ হয়ে গেল। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে এক নবজাত শিশুর ডুকরে ডুকরে কান্নার আওয়াজ ওর কানের পর্দায় ধাক্কা দিতে লাগল। আর বেশ কয়েকবার ওর মনে হল, যেন ওর বুকের দুধ এখনও টপটপ করে পড়ছে। কিন্তু ওর এই অনুভব, ও ওর মাকে বলল না। কিন্তু ও যখন নিজের শোবার ঘরে বিশ্রাম করার জন্যে গেল, সেখানে সে ব্লাউজ খুলে তার স্তনের দিকে তাকাল। দেখল, ওর স্তন ভরাট হয়ে আছে।

ও হামেশাই বাচ্চার কান্না শুনত। কিন্তু ও বুঝতে পারল, এসব মনের ভুল। আদতে সবসময়েই ওর মস্তিষ্কের মধ্যে হাতুরির ঘা পড়ত, কেন ওর বাচ্চা-কাচ্চা হচ্ছে না!

ও নিজেও ভীষণভাবে একাকীত্ব অনুভব করত। আর সে একাকীত্ব যে কোন বিবাহিত নারীর জীবনে আসা খুবই স্বাভাবিক।

ও এখন হামেশাই উদাস হয়ে পড়ত। পাড়ার বাচ্চা-কাচ্চারা কেউ হট্টোগোল করলে ওর কান যেন ফেটে পড়ত। ইচ্ছে করত, বাইরে গিয়ে ওদের গলা টিপে মেরে ফেলে। কিন্তু ওর স্বামী ইলমুদ্দিনের সন্তান-

সন্তানের জন্যে চিন্তা-ভাবনা ছিল না। ওর কাপড়ের ব্যবসা দিনের পর দিন রমরমা হচ্ছিল। ওর মাসিক আয় আগের চেয়ে দুগুন বেড়ে গিয়েছিল। ওর এই আয় বৃদ্ধিতে জুবেদার মধ্যে এতটুকু খুশীর সঞ্চার হয়নি। ওর স্বামী ওর হাতে টাকার বাণ্ডিল দিলে, ও সে টাকা থলিতে রেখে গুন গুন করে ঘুম-পাড়ানি গান গাইত, তারপর কোন কাল্পনিক দোলনায় টাকা রেখে দোলনা দিত।

একদিন ইলমুদ্দিন দেখল, সে যে টাকা তার স্ত্রীকে দিয়েছিল তা দুধের হাড়ির মধ্যে রাখা। সে বিস্মিত হল, এ টাকা দুধের হাড়ির মধ্যে কিভাবে এল। তাই সে জুবেদাকে জিজ্ঞেস করল, এ টাকা হাড়ির মধ্যে কে রেখেছে ?

জুবেদা বলল, "খোকা ভীষণ দুষ্টু হয়েছে। মনে হয় এই দুষ্টুমি ও-ই করেছে।"

ইলমুদ্দিন আশ্চর্য হল। বলল, "এখানে বাচ্চা-কাচ্চা কোথায় ?"

জুবেদাও তার স্বামীর চেয়ে আরো বেশী আশ্চর্য হল, "কেন আমাদের বাড়িতে কি বাচ্চা নেই ? তুমি এসব কি বলছ ? খোকা এখুনি ইস্কুল থেকে ফিরবে। ও এলে জিজ্ঞেস করব এ দুষ্টুমি কে করেছে ?"

ইলমুদ্দিন বুঝতে পারল, তার স্ত্রীর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

ও মনে মনে জুবেদার মাথা গণ্ডগোল হওয়ার জন্যে আফসোস করতে লাগল। কিন্তু কিভাবে ওর চিকিৎসা করবে তা ও জানত না। সে তার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করল। কেউ পরামর্শ দিল, স্ত্রীকে পাগলা-গারদে পাঠানোর জন্যে। কিন্তু এই পরামর্শ ওর কাছে হৃদয়হীন মনে হল। ও দোকানে যাওয়া-আসা ছেড়ে দিল। সব সময় বাড়িতে থেকে জুবেদাকে দেখাশোনা করতে লাগল। যাতে ও কোন ভয়ঙ্কর ধরনের কোন কাণ্ড করে না বসে।

ইলমুদ্দিন সব সময় বাড়িতে থাকার জন্যে জুবেদার অবস্থা কিছুটা উন্নত হল। কিন্তু ওর ভীষণ চিন্তা হতে লাগল ব্যবসাপত্র কে চালাচ্ছে। সে বেশ কয়েকবার তার স্বামীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেসও করেছে, "তুমি দোকানে কেন যাচ্ছ না ?"

ইলমুদ্দিন অত্যন্ত ভালোবাসার সঙ্গে জুবেদাকে বলল, "কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই কয়েক দিন বিশ্রাম নিচ্ছি।"

"কিন্তু দোকানের ভার যার ওপর দিয়েছ, সে বিশ্বাসী তো ?"

"হ্যাঁ, খুব বিশ্বাসী। পাই পাই পয়সার হিসেব দেয়। কোন চিন্তা কর না।"

জুবেদা বেশ চিন্তিত কণ্ঠে বলল, "আমি কেন চিন্তা করব না? সন্তানের মা, নিজের জন্যে কোন রকম চিন্তা করি না, কিন্তু সন্তানের জন্যে তো চিন্তা হয়...যদি তোমার কর্মচারী টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় তবে খোকার কি...।"

ইলমুদ্দিনের চোখ ছলছল করে উঠল, "জুবেদা ওর জন্যে ভেব না। ওর রক্ষাকর্তা আল্লাহ। আর আমার কর্মচারীও বিশ্বাসী।"

"আমার কেন চিন্তা হবে না...সন্তানের জন্যে মা চিন্তা-ভাবনা না করলে আর কে করবে।"

ইলমুদ্দিন খুবই চিন্তিত ছিল, কি করবে বুঝতে পারছিল না।... জুবেদা সারা দিন ধরে তার কল্পনার সন্তানের জন্যে জামা-কাপড় সেলাই করত, সোয়েটার বুনত। বেশ কয়েকবার সে তার স্বামীকে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মাপের অনেকগুলো স্যান্ডেল কিনিয়ে এনেছিল। প্রতি মাসে সে নিজেই এই সব স্যান্ডেলে পালিশ করত।

ইলমুদ্দিন ওর সব কাজই দেখত। ওর হৃদয় কান্নায় ভেঙে পড়ত। মনে মনে ভাবত, সে নিজে যে পাপ করেছে, এখন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। কিন্তু কি সে পাপ? সে নিজেই সে পাপের কোন হদিশ খুঁজে পায় না।

একদিন ইলমুদ্দিনের তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। তাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। ওর এই উদ্বিগ্নের কারণ জিজ্ঞেস করায় সে জানতে পারল, একটি মেয়ের সঙ্গে তার প্রেম আছে। মেয়েটি মা হতে চলেছে। গর্ভপাতের সব ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু এখনও করা হয়নি। ইলমুদ্দিন তাকে বলল, "গর্ভপাত করিস না, বাচ্চা হোক।"

ওর বন্ধু বলল, যে বাচ্চা হবে, তার প্রতি ওর কোন মমতা নেই। বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব?

"বাচ্চা আমাকে দিয়ে দিস।"

বাচ্চা হওয়ার আর কিছুদিন বাকি ছিল। তাই এই সময়টাকে ইলমুদ্দিন কাজে লাগাল। জুবেদার মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করাল, সে গর্ভবতী। মাসখানেকের মধ্যে তার বাচ্চা হবে।

ওর বন্ধুর প্রেমিকার একটি পুত্র-সন্তান হল। জুবেদা যখন ঘুমিয়ে ছিল, ইলমুদ্দিন তার পাশে বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিল। তারপর জুবেদাকে জাগিয়ে বলল, "জুবেদা, কতক্ষণ আর এভাবে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে, এই দেখ, তোমার বুকের কাছে কে শুয়ে আছে ?"

জুবেদা তার পাশে এক সুন্দর বাচ্চাকে দেখল। বাচ্চাটা হাত-পা ছুঁড়ছিল। জুবেদা খুব খুশী হল, "এ বাচ্চা কখন হল ?"

ইলমুদ্দিন বলল, "ভোর সাতটায়।"

"বাঃ, আমি জানতেই পারিনি। মনে হচ্ছে প্রসবের ব্যাথায় আমি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম।"

পরের দিন ইলমুদ্দিন দোকানে যাওয়ার আগে স্ত্রীকে দেখতে গেল। দেখল ওর স্ত্রীর সারা গায়ে রক্ত। ওর হাতে চাকু। চাকু দিয়ে সে তার স্তন কাটছে। ইলমুদ্দিন ওর হাত থেকে এক ঝটকায় চাকুটা ছিনিয়ে নিল। "এ কি করছ ?"

জুবেদা তার পাশে শোয়া বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলল, ও সারা রাত কেঁদেছে। আমার স্তন থেকে দুধ বের হচ্ছে না। তাই....!"

এর বেশী আর একটি কথাও ও বলতে পারল না। রক্তে-ভেজা একটা আঙুল ও বাচ্চার মুখে ছোঁয়াল আর চিরদিনের জন্যে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল।

ঘোড়া-গাড়ির আড্ডায় মঙ্গু কোচওয়ানকে সবাই চৌখস বুদ্ধিমান বলে মনে করে। লেখাপড়া বলতে যা বোঝায়, তার ধারে কাছে সে কোন দিন যায়নি—এ ব্যাপারে সে একেবারে অষ্টরম্ভা। কোনদিন ইস্কুলের দোরগোড়া সে মারায়নি, কিন্তু সারা দুনিয়ার সমস্ত খবরাখবরই তার নখদর্পণে। আড্ডার যত কোচওয়ান, যারা সারা দুনিয়ায় কি কি ঘটনা ঘটছে জানতে চাইত, তারা তা ওস্তাদ মঙ্গুর কাছ থেকে জেনে নিত।

কয়েক দিন আগে ওস্তাদ মঙ্গু যখন তার এক সওয়ারির কাছ থেকে স্পেনের যুদ্ধের কথা শোনে, তখন সে গামা চৌধুরীর প্রসস্থ কাঁধ চাপড়াতে চাপড়াতে বেশ বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গে ভবিষ্যৎবানী করে, "চৌধুরী দেখ, আর দিন কয়েকের মধ্যে স্পেনে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।"

গামা চৌধুরী যখন তাকে জিজ্ঞেস করল, স্পেন কোথায়, তখন ওস্তাদ মঙ্গু বেশ গম্ভীরভাবে তার সে প্রশ্নের জবাবে বলল, "বিলাইতে, আবার কোথায়?"

স্পেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা তখন সবাই শুনল, তখন স্টেশনে কোচ-ওয়ানদের এক আড্ডায় সব কোচওয়ানরা গোল হয়ে বসে হুকো খাচ্ছিল। তাদের সবার চোখে ওস্তাদ মঙ্গু তখন এক মহান ব্যক্তি। আর ঠিক তখন, মাল রোডের শান-বাঁধানো ঝকঝকে তকতকে রাস্তার ওপর টাঙ্গা চালাতে চালাতে ওস্তাদ মঙ্গু আলোচনারত তার সওয়ারিদের কাছ থেকে হিন্দু-মুসলমানদের যে বিবাদ, সেই বিবাদের কথা শুনছিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সে যখন আড্ডায় এল, তখন তার সারা চোখ-মুখ রাগে লাল। এক হাত থেকে আর এক হাতে হুকো ঘুরতে ঘুরতে যখন হিন্দু-মুসলমানের বিবাদের কথা উঠল, তখন ওস্তাদ মঙ্গু মাথা থেকে পাগাঁড় খুলে বগলের নিচে চেপে ধরে বলতে লাগল:

"এ নিশ্চয়ই কোন পীরের অভিশাপ, তাই হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে চাকু মারছে। আমি আমার বাপ-ঠাকুরদার কাছে শুনেছি, বাদশা আকবর কোন এক দরবেশের মনে দুঃখ দিয়েছিলেন। দরবেশ তাই অভিশাপ দেন, তোর হিন্দুস্তানে সব সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে থাকবে। বাদশা আকবরের

রাজত্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্তানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়।” কথা কটি বলে মঙ্গু বুক ভরে এক দীর্ঘ ঠাণ্ডা শ্বাস নেয়। তারপর হুকোতে এক জোর দম লাগিয়ে বলতে শুরু করে, “এই কংগ্রেসীরা হিন্দুস্তানকে আজাদ করতে চায়! কিন্তু আমি বলছি, এরা যদি হাজার বছর ধরে মাথা কুটে মরে, তবু কিছু হবে না। বড় জোর ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে যাবে। ইতালিয়ান বা রাশিয়ানরা আসবে। আমি যতটুকু শুনেছি, ওরা খুব শক্তিশালী। তাই বলছি, হিন্দুস্তান চিরদিনই অন্যের গোলামী করবে। ওঃ, হাঁ, আমি বলতে একেবারেই ভুলে গিয়েছি, পীর নাকি এই অভিশাপও দিয়েছিল, বাইরের শক্তি চিরদিনই হিন্দুস্তানের ওপর রাজত্ব করবে।”

ওস্তাদ মঙ্গু ইংরেজদের ভীষণ ঘৃণা করত। কেন সে এত ঘৃণা করত? সে বলত, তাদের হিন্দুস্তানে ইংরেজরা নিজেদের সিক্কা চালাচ্ছে, আর নানা ধরনের জুলুম করছে। কিন্তু তার এই ঘৃণা করার সবচেয়ে বড় কারণ, সৈনিক ব্যারাকের গোরা সৈন্যরা তাকে খুব জ্বালাতন করে। এমন ব্যবহার করে, যেন সে কোন বেয়াদপ কুত্তা। তাছাড়া সে তাদের গায়ের সফেদ রঙও পছন্দ করে না। যখন সে গোরাদের লাল ও কুষ্ঠ রঙের মতো সাদা দেহের দিকে তাকায়, তখন ওর গা গুলিয়ে ওঠে। জানি না ও কেন বলত, লাল কোঁচকানো চামড়া দেখলেই, আমার মনের মধ্যে সেইসব গলিত লাশের ছবি ভেসে ওঠে।

যেদিন কোন মাতাল গোরার সঙ্গে ওর কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া হত, সেদিন সারাক্ষণ ওর মন অশান্ত থাকত। আর সান্ধ্য-আড্ডায় সিগারেট টানতে টানতে বা হুকোয় জোর দম লাগাতে লাগাতে মন উজার করে গোরাদের খিস্তি দিত।

অশ্লীল গালিগালাজ করতে করতে ও তার ঢিলে পাগড়িতে এক ঝটকা টান মেরে বলত, “শালারা আগুন চাইতে এসে এখন ঘরের মালিক হয়ে বসেছে। আর এমন রোয়াব দেখায় যেন আমরা ওদের বাপ-দাদার চাকর।”

এত গালিগালাজ দেয়ার পরেও ওর রাগ কমে না। ওর কোন সাথী ওর পাশে বসে থাকলে, ও ওর বুকের গভীর থেকে আগুনের হলকা বের করে আনতে থাকে।

“ওদের তো দেখেছিস···যেন কুষ্ঠ রোগী···একেবারে মরা মানুষ।” শূন্যে এক জোর ঘুসি চালিয়ে ও সমানে বকবক করে চলে। যেন ওদের মেরে

ফেলবে। তোর জানের কসম খেয়ে বলছি, "একেক সময় ইচ্ছে হয়, মেরে ওদের মাথা ছাতু করে দিই। কিন্তু মরা-মানুষকে মারা পাপ, তাই চুপ করে যাই।"

এসব বলতে বলতে ও ক্ষণিকের জন্যে চুপ হয়ে যায়। খাকি শার্টের আস্তিন দিয়ে নাক পরিস্কার করে ও আবার বিড়বিড় করতে থাকে।

"আল্লার কসম খেয়ে বলছি, এই লাট সাহেবদের খোশামদ করতে করতে কেমন একটা বিরক্তি ধরে গিয়েছে। এদের প্রেতের মতো চেহারা দেখলে শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ করে ওঠে। যদি কোন নয়া কানুন পাশ হয়, তবেই এদের হাত থেকে মুক্তি। তোর কসম, তখনই ধড়ে প্রাণ আসবে…মন আনন্দে ভরে উঠবে।"

একদিন ওস্তাদ মঙ্গু কোর্ট থেকে তাঁর টাঙ্গায় দু'জন সওয়ারি তুলল। ওদের দু'জনের কথাবার্তা থেকে ও জানতে পারল, হিন্দুস্তানে খুব শিগগিরিই নতুন আইন চালু হবে। শুনে ওর মন আনন্দে নেচে উঠল।

দু'জনেই ছিল মারোয়াড়ি। দেওয়ানি মামলার ব্যাপারে আদালতে এসেছিল। আদালতের কাজ সেরে ঘরে ফেরার পথে টাঙ্গায় বসে তারা নতুন আইন অর্থাৎ 'ইন্ডিয়া এ্যাক্ট' নিয়ে কথা বলছিল।

"শুনেছি, পয়লা এপ্রিল থেকে হিন্দুস্তানে নয়া কানুন চালু হবে; সত্যি?…সব কিছুই কি তবে পাল্টে যাবে?"

"না সবকিছু পাল্টাবে না, তবে অনেক কিছুই পাল্টাবে। হিন্দুস্তানীরা আজাদ হবে।"

"সুদ-টুদ নিয়ে কি কোন নতুন আইন পাশ হবে?"

"জানতে হবে। কালকে না হয় কোন উকিলকে জিজ্ঞেস করব।"

এই দু'জন মারোয়াড়ির আলাপ-আলোচনা শুনে ওস্তাত মঙ্গুর হৃদয়ে এক খুশী ও আনন্দের ঢেউ খেলতে শুরু করল। ও হামেশাই ওর ঘোড়াকে খিস্তিখেউড় করে চাবুক দিয়ে ভীষণ পেটায়, কিন্তু সেদিন টাঙ্গা চালাতে চালাতে সে বারবার পিছন ঘুরে তার দুই মারোয়াড়ি সওয়ারিকে দেখছিল। আর তার ঘন বড় বড় গোঁফ এক আঙুল দিয়ে তা দিতে দিতে ঘোড়ার লাগাম ঢিলে করে দিচ্ছিল। আর খুব আদরের সঙ্গে তার ঘোড়াকে বলছিল, "চল, বেটা চল। হাওয়ার সঙ্গে একটু পাল্লা দিয়ে চল।"

মরোয়াড়িদের নামিয়ে দিয়ে সে সোজা আনারকলিতে এল। সেখানে

দীন, হালুইকারের দোকানে আধসের দইয়ের লস্যি খেয়ে সে এক বিরাট ঢেকুর তুলল। আর তার বড় বড় গোঁফ দু' ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে চুষতে চুষতে জোর গলায় হেসে উঠল, 'দূর, তোর নিকুচি করেছি।"

সন্ধ্যার সময় সে যখন টাঙ্গার আড্ডায় ফিরে এল, সেখানে তার পরিচিত কোন কোচওয়ান ছিল না। ফলে তার বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হল। আজকে সে তার দোস্তদের এক বিরাট খবর শোনাতে চাইছিল। সে সেই খবর তার বুকের গভীর থেকে উৎসারিত করার জন্যে ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। কিন্তু কোন পরিচিতকে সে পেল না।

প্রায় আধ ঘণ্টার মতো চাবুক বগলে চেপে ধরে স্টেশনের টিনের শেডের নিচে এক অদ্ভুত অস্বস্তি নিয়ে সে পায়চারি করতে লাগল। ওর সারা মস্তিষ্ক জুড়ে একটি সুচারু সুন্দর 'বিচারধারা' বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল। নয়া কানুনের খবর তাকে এক নতুন জগতে উপস্থিত করল। পয়লা এপ্রিল থেকে নয়া কানুন হিন্দুস্তানে চালু হবে। ফলে ওর মস্তিষ্কের সমস্ত দীপ প্রজ্বলিত হয়ে চিন্তা করতে শুরু করল। মারোয়াড়িদের কথাগুলি বারবার ওর কানের মধ্যে গুনগুন করছিল। সুদের ব্যাপারেও কি নয়া কানুন চালু হবে? আর সঙ্গে সঙ্গে ওর সারা দেহ-মনে এক আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। সে তার ঘন গোঁফের আড়ালে বার কয়েক মুচকি হাসল। সে মারোয়াড়িদের উদ্দেশ্যে খিস্তি দিল, গরীবদের রক্তচোষা ছারপোকা কোথাকার! নতুন আইন-কানুন যাই আসুক সব এদের কাছে ডাল বরাবর।

ও ভীষণ আনন্দিত। যখন ও ভাবত, এই গোরারা সফেদ ইঁদুরের থুথনি (গোরাদের সে এই নামেই ভাবত), বিশেষ করে তখন ওর মনের মধ্যে একটা শীতল হাওয়া খেলা করত। নতুন আইন চালু হলেই এই সফেদ ইঁদুররা সুরসুর করে সব চিরদিনের মতো গর্তে ঢুকে যাবে!

টেকো নত্থু পাগড়ি বগলে দাবিয়ে যখন আড্ডায় এল, ওস্তাদ মঙ্গু তখন ওর দিকে প্রায় ছুটে গেল। ওর হাত নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বেশ চিৎকার করে বলতে লাগল, "নে হাত মেলা, আজ তোকে এমন খবর দেব যে, তোর হৃদয় খুশীতে নেচে উঠবে। খবর শুনে আনন্দে তোর

এই টেকো মাথায় চুল গজাবে।"

বেশ রসিয়ে রসিয়ে কথাগুলি বলে মঙ্গু নতুন আইন সম্পর্কে তার দোস্তকে বলতে লাগল। নতুন আইন সম্পর্কে বলতে বলতে ও কয়েকবার টেকো নত্থুর হাতে জোর চাটি মারল। "দেখিস, কি হতে চলেছে। এই রুশ বাদশারা নিশ্চয়ই একটা কিছু করবে।"

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় উত্তেজনার যে সব ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে ওস্তাদ মঙ্গু কিছু কিছু শুনেছে। সেখানকার নতুন আইন-কানুন, আর সেখানকার নতুন নতুন ঘটনা তার কাছে খুব ভালো লাগছিল। তাই সে 'রুশ বাদশার' সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান এ্যাক্টকে',—মানে নয়া কানুনকে মিলে মিশিয়ে একাকার করে ফেলল। পুরনো ব্যবস্থার মধ্যে পয়লা এপ্রিলে যে নতুন পরিবর্তন আনছে, সেই পরিবর্তনকে সে 'রুশ বাদশার' প্রভাবে হচ্ছে বলে মনে করত।

বেশ কিছুদিন হয় পেশওয়ার এবং অন্যান্য শহরে 'লাল-কুর্তার' আন্দোলন হচ্ছিল। ওস্তাদ মঙ্গু সেই আন্দোলনকে 'রুশ বাদশা' এবং নতুন আইনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলল। এসব ছাড়াও, ও যখন শুনত, ওমুক শহরে বোমা বানাতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছে বা ওমুক জায়গায় বিদ্রোহ করার অপরাধে এতজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তখন ও ভাবত, এ সমস্ত কিছুই নতুন আইনের সঙ্গে জড়িত। আর ও মনে মনে খুশীতে টগবগ করত।

একদিন দু'জন ব্যারিস্টার তার টাঙ্গায় বসে নতুন আইন-কানুন নিয়ে বেশ মশগুল হয়ে আলোচনা করছিল। আর ও চুপচাপ বসে তাদের সেই আলোচনা শুনছিল। ব্যারিস্টারদের একজন আর একজনকে বলছিল।

"নতুন আইনের একটা দিক হচ্ছে ফেডারেশন। এই ফেডারেশন যে কি বস্তু, তা আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এরকম ফেডারেশনের কথা দুনিয়ার ইতিহাসে কোন উল্লেখ নেই, বা দেখাও যায়নি। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে এই ফেডারেশন সম্পূর্ণভাবে ভুল, বরং বলা যায় এ কোন ফেডারেশনই নয়।"

এই দু'জন ব্যারিস্টারের নিজেদের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল, তার অধিকাংশই হচ্ছিল ইংরেজিতে। তাই ওস্তাদ মঙ্গু এই বিশেষ বিশেষ ইংরেজি শব্দগুলি কোনরকমে বোঝার চেষ্টা করছিল। বুঝতে পারছিল

ভারতবর্ষে যে নতুন আইন-কানুন আসছে, তা এরা ভালো চোখে দেখছে না। আর ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক তাও তারা চায় না। এই দু'জন ব্যারিস্টারের দিকে ঘৃণাভরে তাকিয়ে সে বলল, "দাঁড়াও টোরির বাচ্চারা।"

ও যখন কাউকে নিচু গলায় 'টোরির বাচ্চা' বলে গালিগালাজ-করত তখন ওর খুব আনন্দ হত। কারণ ও মনে করত, ঠিক জায়গা মতো ও এই শব্দটি প্রয়োগ করতে পেরেছে। ভালো মানুষ আর টোরির বাচ্চার মধ্যে যে ফারাক, সেই ফারাক বোঝার মতো অন্তত ওর ক্ষমতা ছিল।

এই ঘটনার তিন দিন পরে গভর্নমেন্ট কলেজের তিনজন ছাত্র ওর টাঙ্গা করে মজংগ যাচ্ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে-আলোচনা করছিল ঃ

"নতুন আইন আমার আশাকে আরও উজ্জীবিত করল। যদি···সাহেব এসেম্বলির মেম্বার হতে পারেন, তবে কোন সরকারী অফিসে আমার একটা-না-একটা চাকরি হয়ে যাবে।"

"আশা আমারও আছে। হয়তো এই নতুন আইন চালুর হৈ-হট্টগোলে আমারও কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।"

"অবশ্যই।"

"আমরা যারা বেকার গ্রাজুয়েট, চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছি, অন্তত তার সংখ্যা তো কিছু কমবে।'

এইসব আলাপ-আলোচনা নতুন আইন সম্পর্কে ওস্তাদ মঙ্গুর মনে নতুন আশা এবং গুরুত্ব সঞ্চার করল। আর সে এই নতুন আইনকে এমন এক বস্তু বলে মনে করত, যা উজ্জ্বল। নতুন আইন—তাই সে এই নতুন আইন নিয়ে যখনই সময় পেত তখনই ভাবত। আর যখনই ভাবতে বসেছে, তখনই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তার ঘোড়ার নতুন সাজ, যে সাজ সে বছর দুয়েক আগে চৌধুরী খোদাবক্সের কাছ থেকে দাম-দস্তুর করে কিনেছিল। এই সাজ যখন নতুন ছিল, তখন সেই সাজের মাঝে মাঝে নিকেল-করা লোহার পেরেক বসানো ছিল। আর সে নিকেল-করা পেরেকগুলো ঝলমল করত। এই সাজের যেখানে-যেখানে পেতলের কারুকার্য ছিল, তা সোনার মতো জ্বল জ্বল করত। তাই নতুন আইনও তার কাছে জ্বল জ্বল করছিল।

পয়লা এপ্রিল পর্যন্ত ওস্তাদ মঙ্গু নতুন আইনের বিপক্ষে এবং সপক্ষে অনেক আলোচনা শোনে। কিন্তু এই নতুন আইন সম্পর্কে যে তার মনের

মধ্যে যে কল্পনার জাল বুনেছিল, যে সেই কল্পনার জাল ছিঁড়তে চাইল না। ওর ধারণা ছিল, পয়লা এপ্রিল নতুন আইন চালু হলেই সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর ওর বিশ্বাস ছিল, এই আইন চালু হলেই, ওর দু'চোখে যা পড়বে, তাতে ওর চোখ হিম শীতল হয়ে যাবে।

মার্চ মাসের একত্রিশ দিন শেষ হয়ে গিয়েছে, এপ্রিল মাস শুরু হওয়ার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা নিস্তব্ধ রাত্রির বাকি। কিন্তু মরশুম যে রকম হওয়া উচিত, তা না হয়ে বরং ঠাণ্ডা ছিল। আর তাজা হাওয়া বইছিল।

পয়লা এপ্রিলে, কাক-ডাকা ভোরে ওস্তাদ মঙ্গুর ঘুম ভাঙল। উঠে আস্তাবলে গেল, ঘোড়ায় গাড়ি যুতল। যুতে বাইরে এল। আজকে ওর মন এক অদ্ভুত ধরনের আনন্দে ভরপুর।...আজ ও নতুন আইন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে।

ও ভোরের এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়ার নিজের মধ্যে একটা উত্তেজনা অনুভব করতে করতে গলি এবং বাজারে একটা চক্কর কাটল। কিন্তু সমস্ত কিছুই আগে যেমনটি ছিল, তেমনি পুরনো-পুরনো ঠেকল। আকাশের মতো পুরনো। আজকে ও ওর চোখ দিয়ে বিশেষ একনতুন রূপও রঙপ্রত্যক্ষ করতে চাইছিল। শুধু ওর ঘোড়ার মাথায় লাগানো রঙ বেরঙের কলগি বা ঝুমকো ছাড়া আর কোন কিছুই ও রঙিন দেখল না। সমস্ত কিছুই যেমন পুরনো ছিল, তেমনি পুরনো দেখল। নতুন আইন চালু হবে এই আনন্দের আতিশয্যে ও চৌধুরী খোদাবক্সের দোকান থেকে সাড়ে চোদ্দ আনা দিয়ে এই নতুন কলগি কিনে এনেছিল।

ঘোড়ার খুরের টগবগ আওয়াজ, পিচ-কালো সড়ক, সড়কের আশ-পাশ, কিছু দূরের দূরের লাইট পোস্ট, দোকানের সাইন বোর্ড, ওর ঘোড়ার গলায় বাঁধা ঘুঙুরের শব্দ, বাজারের চলন্ত মানুষ—এসব কি নতুন। না, কোন কিছুই নতুন নয়। কিন্তু তবু ওস্তাদ মঙ্গু এতটুকু নিরাশ হল না।

"এখন সবে ভোর। দোকানপাট এখনও খোলেনি।" এসব প্রশ্নের উত্তর ওর মনকে শান্ত করল। ও আরও ভাবছিল, "হাইকোর্টে তো নটার পরেই কাজ শুরু হয়। এর আগে নয়া কানুন কিভাবে বোঝা যাবে?"

টাঙ্গা চালিয়ে ও যখন গভর্নমেণ্ট কলেজের সামনে এল, তখন কলেজের বড় ঘড়ি বেশ দেমাক নিয়ে নটার ঘণ্টা বাজাল। যে সব ছাত্ররা কলেজের গেট দিয়ে বাইরে আসছিল, তাদের বেশ হাসিখুশীই দেখাচ্ছিল। কিন্তু

কেন যেন ওদের জামা-কাপড় ওস্তাদ মঙ্গুর ময়লা-ময়লা ঠেকল। বোধ হয় ও চাইছিল, উজ্জ্বল কোন জিনিস ওর চোখকে ধাঁধিয়ে দিক।

ওস্তাদ মঙ্গু আবার তার টাঙ্গাকে ডাইনে ঘুরিয়ে এগিয়ে চলল। একটু বাদেই ও আনারকলির কাছে এল। এতক্ষণে বাজারের অর্ধেক দোকান খুলে গিয়েছিল। লোকজনের চলাচলও বেড়েছে। হালুইকারের দোকানের সামনে খরিদ্দারের বেশ ভীড়। স্টেশনারি দোকানের কাঁচের শো কেসে সাজানো দামী ও সুন্দর জিনিসগুলো পথ চলতি মানুষের নজর কাড়ছিল। আর বৈদ্যুতিক তারের ওপর পায়রাগুলি বকম-বকম করে ঝগড়া করছিল। কিন্তু এ-সমস্ত কিছুর প্রতিই ওস্তাদ মঙ্গুর কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না।…ও নয়া কানুন সেইভাবে দেখতে চাইছিল, ঠিক যেভাবে ও ওর ঘোড়াকে দেখছিল।

ওস্তাদ মঙ্গুর বাড়িতে যখন বাচ্চা পয়দা হওয়ার কথা, ঠিক সেই সময়… প্রায় চার-পাঁচ মাস ওর এমনই উৎসুকতা নিয়ে কেটেছিল। ও জানত, একদিন-না-একদিন বাচ্চা হবেই। সময় এবং দিন যেন আর কাটছিল না। ও তখন চাইছিল, নিজের সন্তানকে এক ঝলক অন্তত দেখতে পায়। তারপর অনেক দিন ধরে সন্তানের জন্ম হতে থাকুক না কেন তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর এই অস্বাভাবিক ইচ্ছার আবেগে সে তার অসুস্থ স্ত্রীর পেট টিপে টিপে এবং পেটের ওপর কান রেখে সন্তানের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু জানতে চাইত। কিন্তু কিছুই জানতে বুঝতে পারত না। অপেক্ষা করতে করতে একদিন ওর মেজাজ এমন তিরিক্ষি হয়ে উঠল যে, ও ওর স্ত্রীকে মেরে বসল।

"তুই তো দেখছি, হরবকত মরার মতো পড়ে রয়েছিস। উঠে দাঁড়া, হাঁটা-চলা কর। শরীরে একটু তাগদ তো আসুক। শুকনো কাঠ দিয়ে কি হবে! তুই কি মনে করিস, এরকম শুয়ে থাকলেই বাচ্চা পয়দা হবে।"

ওস্তাদ মঙ্গুর দেহের গড়ন যেমন ছিল, তার চেয়ে সে ছিল অনেক বেশী চটপটে। প্রতিটি জিনিসের আসল রূপ কি, তা দেখার জন্যে ওর শুধু আগ্রহই ছিল না, তার অনুসন্ধানও করত। ওর স্ত্রী গঙ্গাদেবী ওর এই ধরনের অহেতুক আগ্রহ দেখে সব সময়েই ওকে বলত, "কুয়ো খোরা শেষ না হতেই, তুমি জলের জন্যে ছটফট কর।"

যা কিছুই ঘটুক না কেন, ওর স্বভাব অনুযায়ী যতখানি উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা ছিল, নতুন আইনের জন্যে ও ততখানি উদ্বিগ্ন ছিল না। ও আজ

নতুন আইন দেখার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। যেমন ও গান্ধী বা জওহরলালের মিছিল দেখার জন্যে বেরিয়ে পড়ত।

ওস্তাদ মঙ্গু হামেশাই নেতারা কত বড় মাপের তা উপলব্ধি করত, তাদের মিছিলের হাঙ্গামা এবং গলার মালা দেখে। যদি কোন নেতার গলায় গাদা ফুলের মালা থাকত, তবে সে ওস্তাদ মঙ্গুর কাছে বিরাট নেতা। যে নেতার মিছিলের ভীড়ের জন্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়ার উপক্রম হত, সে ওর কাছে আরও বিরাট নেতা। তাই সে আজ নতুন আইনকে তার অনুভব এবং উপলব্ধির দাড়িপাল্লায় চাপিয়ে ওজন করতে চাইছিল।

আনারকলি থেকে বেরিয়ে ওস্তাদ মঙ্গু মাল রোডের ঝকঝকে তকতকে রাস্তার ওপর দিয়ে ঢিমে তেতলায় টাঙ্গা নিয়ে এগিয়ে চলল। মটরের দোকানের কাছে সে ছাউনির এক সওয়ারি পেল। ভাড়া ঠিক হওয়ার পর, ও ওর ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশল। আর মনে মনে ভাবল, "যাক, ভালোই হল।...হয়তো ছাউনি থেকে নতুন আইন সম্পর্কে কোন খবর টবরও পাওয়া যেতে পারে।"

ছাউনিতে সে তার সওয়ারিকে নামাল। তারপর পকেট থেকে সিগারেট বের করে বাঁ হাতের দু' আঙুলের ডগায় চেপে ধরে আগুন জ্বালাল এবং টাঙ্গার পিছনের সিটে গিয়ে বসল।

ওস্তাদ মঙ্গু যখন কোন সওয়ারির প্রত্যাশা করত, বা ঘটে-যাওয়া কোন ঘটনা নিয়ে গভীর চিন্তা করত, তখন সে সামনের সিট থেকে পিছনের সিটে গিয়ে বসত, আর ঘোড়ার লাগাম ডান হাতের মুঠোয় চেপে ধরত। ফলে ঘোড়া প্রথমে একটু চিঁহি চিঁহি করে উঠত, তারপর ঢিমে তালে চলতে লাগত। বুঝতে পারত, কিছুক্ষণের জন্যে তাকে আর জোর কদমে ছুটতে হবে না।

ঘোড়ার দুলকি চাল, আর ওস্তাদ-মঙ্গুর ভাবনা ধীরে ধীরে পাক খেত। ঘোড়া যেমন দুলকি চালে চলার সময় ধীর ছন্দে পা-ওঠায়-নামায়, ঠিক তেমনি ওস্তাদ মঙ্গুর সারা দেহে মনে আইন সম্পর্কে নতুন অনুভূতি ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছিল।

নতুন আইন জারি হওয়ার পর মিউনিসিপ্যালিটি থেকে টাঙ্গার নম্বর যে-ভাবে দেয়, সে সেই নম্বর দেয়ার পদ্ধতিকে নতুন আইনের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করতে লাগল। ও এই বিচার-বিশ্লেষণের

মধ্যে এমন ডুবে গিয়েছিল যে, হঠাৎ ওর মনে হল কোন সওয়ারি যেন ওকে ডাকছে। পিছনে ঘুরে তাকাতেই রাস্তার ও-পারে একজন গোরাকে ও দেখতে পেল। গোরা তাকে হাতের ইশারা করে ডাকছিল।

ওস্তাদ মঙ্গু গোরাদের ভীষণ ঘৃণা করত। নতুন সওয়ারি গোরা দেখে ওর মধ্যে প্রচণ্ড ঘৃণার ভাব জেগে উঠল। প্রথমে ওর ইচ্ছে হল, ও কোন সাড়াই দেবে না,—ওকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। কিন্তু পর মুহূর্তেই ওর মনে হল, ওর কাছ থেকে পয়সা খিঁচে না-নেয়া বোকামী হবে। কলগির জন্যে অযথা যে সাড়ে চোদ্দ আনা খরচ হয়েছে, সেই পয়সা ওর পকেট থেকে উসুল করতে হবে।

জনশূন্য রাস্তায় ও বেশ কায়দা করে টাঙ্গা ঘোরাল। ঘোড়ার পিঠের ওপর হাওয়ায় চাবুকের শব্দ তুলল। আর পলক ফেলতে না ফেলতেই ল্যাম্প পোস্টের কাছে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে গাড়ি দাঁড় করাল। পিছনের সিটে বসেই গোরাকে জিজ্ঞেস করল ঃ

"সাহাব বাহাদুর কোথায় যাবে ?"

ওর এই প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের ভাব ছিল। 'সাহাব বাহাদুর' উচ্চারণের সময় ওর গোঁফওয়ালা ঠোঁট নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল, আর ওর গালের পাশে যে সামান্য কাটা দাগ ছিল, তা নাকের দিকে ঠেলে উঠল, এবং কাঁপতে কাঁপতে সে-দাগ আরও গভীর ক্ষতে পর্যবসিত হল। যেন কেউ ধারালো চাকু দিয়ে ধূসর শিশের পাতে ধার দিচ্ছে। ওর সারা চোখে-মুখে একটা হাসির ঝিলিক খেলছিল, যেন নিজের বুকের আগুন দিয়ে সে সেই গোরাকে ভষ্মিভূত করছিল।

ল্যাম্প পোস্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাওয়া বাঁচিয়ে গোরা সিগারেট ধরাচ্ছিল। সিগারেট ধরাতে ধরাতে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে টাঙ্গার পা-দানির দিকে পা বাড়াল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদ মঙ্গুর চোখ ওর চোখের ওপর পড়ল। মঙ্গুর মনে হল, তারা দু'জন সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। আর সে গুলি যেন ঠোকাঠুকি লেগে আগুনের এক পিণ্ড হয়ে আসমানের দিকে উড়ে গেল।

ওস্তাদ মঙ্গু তার ডান হাতের মুঠোয়-ধরা লাগামকে একটু ঢিলে করে টাঙ্গা থেকে নামল। নামতে নামতে ও তার সামনে দাঁড়ানো গোরাকে তার চোখ দিয়ে এমন ভাবে চিবিয়ে খাচ্ছিল, আর গোরা তার নীল রঙের প্যান্ট

থেকে কি যেন ঝেড়ে ফেলছিল, দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন ওস্তাদ মঙ্গুর আক্রমণ থেকে এভাবে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

গোরা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মঙ্গুকে জিজ্ঞেস করল, "ষানা মাংগটা, ইয়া ফির গড়বড় করেগা।"

'যা বলো'—এই শব্দটি ওস্তাদ মঙ্গুর মগজে হঠাৎ গজিয়ে ওঠে। এবং তার প্রসন্ন বুকেরে মধ্যে নাচতে শুরু করে। "যা বলো"—এই শব্দটি সে তার জিভের ডগায় বারবার নাচাতে লাগল। নাচাতে নাচাতে ওর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, এই সেই গোরা; গত বছর যার সঙ্গে ওর তুমুল ঝগড়া হয়েছিল। সেদিন গোরা বেহেড মাতাল ছিল, মেজাজও ছিল তিরিক্ষি। তাই সেদিন বাধ্য হয়ে তাকে অনেক গালাগালি হজম করতে হয়েছিল। ওস্তাদ মঙ্গু এখন ইচ্ছে করলে গোরার মেজাজ দুরুস্ত করে দিতে পারে, ওকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করতে পারে, কিন্তু অন্য কিছু ভেবে সে নিজেকে গুটিয়ে নিল। ও জানে এ ধরনের ঝগড়াঝাটি বা লড়াই-ফরাই হলে আদালতের কাছে সে-ই দাষী সাব্যস্ত হবে।

গত বছরের ঝগড়া এবং পয়লা এপ্রিলের নতুন কানুনের ওপর ওস্তাদ মঙ্গু তার সমস্ত মন নিবন্ধ করে গোরাকে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে?" ওস্তাদ মঙ্গুর এই দু'টি উচ্চারিত শব্দের মধ্যে চাবুকের শনশন আওয়াজ ছিল।

গোরা বলল "হীরামণ্ডি যাব।"

ওস্তাদ মঙ্গুর গোঁফ থরথর করে কেঁপে উঠল, "পাঁচ টাকা লাগবে।"

ভাড়ার হাঁক শুনে গোরা অবাক হয়ে গেল। চিৎকার করে বলে উঠল, "পাচ টাকা! ঘোড়ার নাদ কোথায়।"

"হাঁ, পাঁচ টাকা।" বলতে বলতে ওস্তাদ মঙ্গু তার লোমশ ডান হাত নিমেষে মুষ্ঠিবন্ধ করল। ওস্তাদ মঙ্গু বেশ কঠিন স্বরে গোরাকে বলল, "যেতে হয় চল, মিছেমিছি কথা বাড়িও না।"

গত বছরের ঘটনার কথা গোরার মনে হতেই, সে ওস্তাদ মঙ্গুর চওড়া বুকের দিকে তাকাল। ও মনে মনে ভাবল, ওর মগজে আবার পোকা কিলবিল করছে। ওস্তাদ মঙ্গুকে একটু শিক্ষা দেয়ার জন্যে ও টাঙ্গার দিকে দু পা এগিয়ে গেল এবং ছড়ি দিয়ে ইশারা করে ওস্তাদ মঙ্গুকে টাঙ্গা থেকে নামতে বলল।

পালিশ-করা বেতের ছড়িটা ওস্তাদ মঙ্গুর পাছায় আলতো ভাবে স্পর্শ করল। ওস্তাদ মঙ্গু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বেঁটেখাটো গোরাকে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত চোখ দিয়ে লেহন করল। সে তার চোখ দিয়ে গোরাকে পিষে ফেলতে চাইল। আর সঙ্গে সঙ্গে হাত মুষ্টিবদ্ধ হল আর কামানের গোলার মতো তা গোরার চোয়ালের ওপর পড়ল। এক ঝটকায় সে গোরার পা সরিয়ে দিল। গাড়ি থেকে এক লাফে নেমে গোরাকে বেধরক পেটাতে লাগল।

গোরা হকচকিয়ে গেল। ওস্তাদ মঙ্গুর ওজনদার ঘুসি থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সে ছোটাছুটি করতে লাগল। যখন ও দেখল, ওস্তাদ মঙ্গু উন্মাদের মতো হয়ে উঠেছে, চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে, তখন ও আতঙ্কে চিৎকার করতে লাগল। ওর এই চিৎকার-চেঁচামেচিতে ওস্তাদ মঙ্গুর হাত আরও দ্রুত চলতে লাগল। ও মনের আনন্দে গোরাকে পেটাতে পেটাতে বলতে লাগল ঃ

"বুঝলে, এ হচ্ছে পয়লা এপ্রিল, এখন আমাদের রাজত্ব।"

ওদের ঘিরে ভিড় জমে গিয়েছিল। পুলিশ অনেক কষ্টে ওস্তাদ মঙ্গুর হাত থেকে কোন রকমে গোরাকে বাঁচাল। ওস্তাদ মঙ্গু দু'জন সিপাই-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ওর বুক দ্রুত ওঠা-নামা করছিল। মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছিল, আর ওর হাসি হাসি চোখ ভিড়ের দিকে তাকিয়ে হাফাতে হাফাতে বলছিল ঃ

"ও-সব দিন চলে গিয়েছে, যা ইচ্ছে তা করার দিন ফুরিয়ে গিয়েছে।··· এখন নয়া কানুন জারি হয়েছে···নয়া কানুন, বুঝলে।"

আর বেচারা গোরা তার মার-খাওয়া চেহারা নিয়ে অবাক হয়ে একবার ওস্তাদ মঙ্গুর দিকে আর একবার ভিড়ের দিকে তাকাচ্ছিল।

পুলিশ ওস্তাদ মঙ্গুকে থানায় ধরে নিয়ে গেল। রাস্তায় যেতে যেতে এবং থানায় সে সমানে চিৎকার করে চলল, "নয়া কানুন, নয়া কানুন।" কিন্তু কেউই তার কথায় কোন কর্ণপাত করল না।

"নয়া কানুন, নয়া কানুন, কি আবোল-তাবোল বকছিস।···সেই একই পুরনো কানুন।"

তাকে থানা হাজতে আটকে রাখা হল।

স্বরাজের জন্যে

কোন্ সাল আমার ঠিক মনে নেই। তবে সেই দিনগুলি শুধু 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সারা অমৃতসর গমগম করত। এই শ্লোগান আমি ভুলতে পারিনি, কারণ এই শ্লোগানে এক অদ্ভুত জোস—এক অদ্ভুত ধরনের যৌবনের মাদকতা ছিল। সেই জোস সেই মাদকতা ছিল অনেকটা অমৃতসরের ঘুটেওয়ালীদের মতো, যারা মাথায় টুকরি নিয়ে বাজারে যেত তা বিক্রির জন্যে। দিনগুলি সত্যিই সুন্দর ছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের সারা পরিবেশে এতদিন যে রক্তাক্ত ঘটনার ভয় জমাট বেধে ছিল তা যেন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল। আজ সেখানে চলেছে এক নির্ভীক তড়পানি। যে তড়পানি ছিল উদ্দেশ্যহীন দৌড়-ঝাঁপের মতো—যার কোন মঞ্জিল—কোন নিশানা ছিল না।

মানুষ শ্লোগান দিত, মিছিল বের করত আর শয়ে শয়ে গ্রেফতার হয়ে যেত। এ এক সুন্দর গ্রেফতার গ্রেফতার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকালে গ্রেফতার করা হত আর সন্ধ্যায় ছেড়ে দেওয়া হত। মোকদ্দমা চলত, কয়েক মাস জেলে কাটিয়ে বেরিয়ে আসত। আবার শ্লোগান দিত, আবার জেলে যেত।

দিনগুলি ছিল জীবনে ভরপুর। একটা ছোট্ট বুদবুদ ফাটলেও তা ঘূর্ণিপাকে পরিণত হত। কেউ চকে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে বলল, "হরতাল করতে হবে," সঙ্গে সঙ্গে হরতাল হয়ে গেল। হঠাৎ এক গুঞ্জনের ঢেউ উঠল, প্রত্যেককে খাদি পরতে হবে। খাদি পরলে ল্যাংকশায়ারের সমস্ত কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কাপড় বয়কট আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। আর প্রতিটি চকে আগুন জ্বলতে লাগল। মানুষ সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গা থেকে কাপড় খুলে সেই আগুনে ছুঁড়ে দিতে লাগল। কোন কোন মহিলারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের অপছন্দ শাড়িগুলি ছুঁড়ে দিত, আর ভিড়েরর লোকজন তালি মেরে হাত লাল করে তুলত।

আমার মনে আছে, কোতয়ালির সামনে, টাউন হলের কাছে এক অগ্নি উৎসব চলছিল। আমার সহপাঠী শেখু উৎসাহে তার রেশমের কোট খুলে কাপড়ের এই জ্বলন্ত চিতায় দিয়ে দিল। তালির সমুদ্র গর্জন করে উঠল।

কারণ শেখর ছিল এক 'টোডি বাচ্চার' ছেলে। তালির গর্জনে শেখরর জোস বেড়ে গেল। বোম্কির জামা খুলে সে আগুনে উৎসর্গ করল। পরে তার মনে পড়ে গেল ঐ জামার সঙ্গে সোনার বোতাম ছিল।

আমি শেখরকে নিয়ে ঠাট্টা করছি না। সেই সব দিনগুলিতে আমার অবস্থাও এই রকম ছিল। মনে হত, হাতে যদি একটা পিস্তল থাকত তবে আমি বিপ্লবী পার্টি বানিয়ে ফেলতাম। বাবা সরকারী পেনসন পেতেন, কিন্তু সে কথা আমি কোন দিন ভাবিনি। আমার ভেতরে এক অদ্ভুত ধরনের উত্তেজনা টগবগ করত। ফ্যাস খেলার সময় যে ধরনের উত্তেজনা টগবগ করে অনেকটা সেই রকম।

স্কুল সম্পর্কে আমার তেমন কোন মমতা ছিল না, তাই পড়শোনার সঙ্গে আমার বেশ শত্রুতা সৃষ্টি হল। বাড়ি থেকে বই-খাতা নিয়ে বেরিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে যেতাম। স্কুল ছুটি না হওয়া পর্যন্ত কোন গাছের ছায়ায় বসে বসে সেখানকার সরগরম দেখতাম বা দূরের বাড়িগুলোর জানালায় দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতাম এদের মধ্যে কোন একজনের সঙ্গে আমার প্রেম হবে। কেন এধরনের চিন্তা আমার মাথায় আসত তা আমি জানি না।

জালিয়ানওয়ালাবাগ তখন খুব জাঁকজমকে ভরা ছিল। চারদিকে লাইন-বন্দী তাবু আর সামিয়ানা খাটানো থাকত। সবচেয়ে বড় সামিয়ানাতে দু' একদিন পরপরই এক একজনকে ডিকটেটর করে বসিয়ে দেওয়া হত। আর সেই ডিকটেটরকে সমস্ত স্বয়ংসেবকরা কুর্ণিশ করত। দু-তিন দিন বা খুব বেশী হলে দশ-পনেরো দিন সেই ডিকটেটর খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে খদ্দরের পোশাক-পরা মহিলা এবং পুরুষদের কাছ থেকে কুর্ণিশ আদায় করত। লঙ্গরখানার জন্যে শহরের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাল এবং আটা সংগ্রহ করত। জালিয়ানওয়ালাবাগে এত আম থাকতে খোদাই জানে তারা কেন এই লপসি খেত আর হঠাৎ একদিন গ্রেফতার হয়ে জেলখানায় চলে যেত।

আমার এক সহপাঠী ছিল—নাম শাহজাদা গুলাম আলী। আমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব কত গভীর ছিল তা শুধু আপনারা এর থেকেই সহজে আন্দাজ করতে পারবেন। আমরা দু'জনে দু' দু'বার একসঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছিলাম, আর একবার আমরা পালিয়ে বোম্বাই গিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল রাশিয়াতে যাব, কিন্তু পয়সা শেষ হয়ে যাওয়ায় আমাদের ফুটপাতে

কাটাতে হয়েছিল, তাই ক্ষমা চেয়ে বাড়িতে চিঠি লিখে ফিরে আসতে হয়।

শাহজাদা গুলাম আলীর চেহারা ছিল খুব সুন্দর। লম্বা, গায়ের রঙ কাশ্মীরীদের মতো লাল টকটকে। তীক্ষ্ম নাক, টানা টানা চোখ। চাল-চলনে এমন এক আভিজাত্য ছিল যে, সেই আভিজাত্যে পেশোয়ারী গুণ্ডাদের মেজাজের এক হাল্কা আভাস ঝিলিক দিয়ে উঠত।

আমার সঙ্গে সে যখন স্কুলে পড়ত তখন সে শাহজাদা ছিল না। কিন্তু শহরে যখন ইনক্লাবের হৈ চৈ পড়ে গেল তখন সে দশ পনেরোটা সমাবেশে এবং মিছিলে যোগ দিল। শ্লোগান দিয়ে, গলায় গাদা ফুলের মালা পরে, প্রেরণা-দীপ্ত গান গেয়ে এবং স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে প্রকাশ্য আলাপ-আলোচনা করে সে এক আধ-পাকা বিপ্লবীতে পরিণত হল। একদিন সে নিজেই বক্তৃতা দিল। পরের দিন খবরের কাগজ দেখে আমি বুঝতে পারলাম গুলাম আলী শাহজাদা হয়ে গিয়েছে।

শাহজাদা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলাম আলী সারা অমৃতসরে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। ছোট শহরে সুনাম আর দুর্নাম ছড়াতে বেশী দেরী লাগে না। অমৃতসরের সমস্ত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট হচ্ছে তারা খুব সমালোচক। একজন আর একজনের দোষ এবং কলঙ্ক খুঁজে বেরায়। কিন্তু রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতাদের ব্যাপারে তারা একেবারে অন্য মানুষ। আসলে তাদের জন্যে সবসময় বক্তৃতা এবং আন্দোলনের প্রয়োজন। আপনি তাদের নীল বর্ণই বানান আর মসি বর্ণই বানান তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। একই নেতা শুধু চোগা-চাপকান পালটিয়ে অমৃতসরে বহুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেন।

কিন্তু সেই দিনগুলি ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। বড় বড় নেতারা সব জেলে ছিলেন। ফলে তাদের গদিগুলি খালি পড়ে ছিল। সেই সময় নেতাদের অভাব মানুষ তত বেশী করে অনুভব করত না। যে আন্দোলন তখন চলছিল তার জন্যে এমন সব মানুষের প্রয়োজন ছিল, যারা দু-একদিন খদ্দরের জামা কাপড় পরে জালিয়ানওয়ালাবাগে সামিয়ানার নীচে বসে দু-একটা ভাষণ দিতে পারে এবং ভাষণ দেওয়ার পর গ্রেফতার হতে পারে।

তখন ইউরোপে সবে ডিকটেটরসিপ চালু হয়েছিল। হিটলার আর মুসোলিনীর নাম-ডাক শুরু হয়েছিল। সুতরাং এর ফলশ্রুতি হিসেবে কংগ্রেসও ডিকটেটর তৈরী করতে শুরু করল। শাহজাদা গুলাম আলীর

সময় আসার আগে চল্লিশ জন ডিকটেটর গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিল।

আমি যখন বুঝতে পারলাম গুলাম আলী ডিকটেটর হয়ে গিয়েছে, তখন আমি তাড়াঘাড়ি করে জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজির হলাম। বড় সামিয়ানার নীচে স্বয়ংসেবকদের পাহারা বসানো ছিল। কিন্তু গুলাম আলী আমাকে দেখতে পেয়ে ভেতরে ডেকে নিল—মাটিতে একটা গদি পাতা ছিল, আর তার ওপর একটা খদ্দরের চাদর বিছানো ছিল। আর এই গদির ওপর একটা পাশ বালিশে হেলান দিয়ে শাহজাদা গুলাম আলী জনা কয়েক খদ্দরের পোশাক-পরা ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা-বার্তা বলছিল। খুব সম্ভব তরিতরকারি নিয়ে আলোচনা চলছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা শেষ করে শাহজাদ স্বয়ংসেবকদের হুকুম দিল। হুকুম দিয়ে সে আমার দিকে তাকাল। তার এই অসাধারণ গাম্ভীর্য দেখে আমার ফিকফিক করে হাসি পাচ্ছিল। স্বয়ংসেবকরা চলে গেলে আমি হেসে বললাম, "এই শালা শাহজাদা।"

আমি অনেকক্ষণ ধরে ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগলাম, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম গুলাম আলীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তন তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল। কয়েকবারে সে আমাকে বলল, "সাদত, এমন হাসি-ঠাট্টা করো না। আমি জানি আমার বুদ্ধি তেমন নেই, কিন্তু যে ইজ্জত আমি পেয়েছি তা তুলনাহীন, তাই আমি এই টুপি পরে থাকতে চাই।"

তারপর সে আমাকে বড় গ্লাসের এক গ্লাস দই-এর লস্যি খাওয়াল। সন্ধ্যার সময় তার ভাষণ শুনতে আসব বলে কথা দিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম।

সন্ধ্যার সময় জালিয়ানওয়ালাবাগ লোকে থৈ থৈ করছিল। আমি একটু আগে-ভাগেই এসেছিলাম বলে স্টেজের কাছে জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম। হাত তালির সঙ্গে সঙ্গে গুলাম আলী স্টেজের ওপর এসে দাঁড়াল। সাদা ধবধবে খাদির পোশাক পরে থাকার জন্যে তাকে আরও সুন্দর এবং আকর্ষক মনে হচ্ছিল। যে মেজার কথা আমি আগে বলেছি সেই মেজাজ বারবার ঝিলিক দিচ্ছিল বলে তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলছিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সে এক নাগারে বলে চলল,—এর মধ্যে কয়েকবার আমার গায়ের লোম খাড়া হয়েছিল। শুনতে শুনতে দু-একবার আমার মনে হয়েছিল আমি বোমার মতো ফেটে পড়ি। খুব সম্ভব সেই সময় আমার

মনে হয়েছিল ফেটে গেলে হিন্দুস্থান স্বাধীন হয়ে যাবে।

একমাত্র খোদাই জানে কত বৎসর কেটে গিয়েছে। সেই সময়কার ভাবনা এবং ঘটনাগুলি কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তা এত বৎসর পর হুবহু তুলে ধরা খুবই মুশকিল। কিন্তু এই গল্প লেখার সময় যখন গুলাম আলীর ভাষণের কথা মনে পড়ছে তখন গোটা একটা তারুণ্য যেন আমার সামনে ভেসে উঠছিল। রাজনীতিতে সেই তারুণ্য ছিল পবিত্র, ছিল সাচ্চা নির্ভীকতা। তা যেন পথ-চলতি কোন মেয়ের হাত ধরে বলেছিল, 'আমি তোমাকে পেতে চাই। কিন্তু পরক্ষণেই যেন আইনের নাগপাশে গ্রেফতার হয়ে গেল। এই ভাষণের পর আমার ওর আর দু-একটি ভাষণ শোনার সুযোগ হয়েছিল। ওর আধ-পাকা পাগলামী উঠতি যৌবন বাচালতা দাড়ি-গোঁফহীন আহ্বান, যে আহ্বান আমি গুলাম আলীর কণ্ঠে শুনেছিলাম, তার সামান্যতম গুঞ্জনও আজ আর শোনা যায় না। এখন যে ভাষণ শুনি তা হচ্ছে ঠাণ্ডা গম্ভীরতায় ভরপুর—পুরনো রাজনীতি এবং কাব্যিক কাব্যিক ভাবে জড়ানো।

আসলে সেই সময় দুটি পার্টিই কাঁচা ছিল। সরকারও কাঁচা ছিল—প্রজাও। ফলে কেউ কাউকে পরওয়া না করে পরস্পরের খটাখটি লেগেছিল। সরকার জেলখানার গুরুত্ব না বুঝে লোককে বন্দী করে চলেছিল—তারাও ধরা দিচ্ছিল। জেলখানায় যাওয়ার আগে জেলখানায় তারা কেন যাচ্ছে তাও জানত না।

এ এক ধোকা ছিল, সেই ধোকার মধ্যে আগুনের এক আভাসও ছিল। মানুষ স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলছিল—নিভছিল, আবার জ্বলে উঠেছিল। এই জ্বলা আর নেভা, নেভা আর জ্বলা গোলামীর বৈরাগ্য উদাস এবং হাই-তোলার মধ্যে এক উষ্ণ কম্পন সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

গুলাম আলীর ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা জালিয়ানওয়ালাবাগ জোর জোর তালি এবং শ্লোগানের আগুনে জ্বলে উঠেছিল। ওর মুখ জ্বল জ্বল করছিল। আমি যখন আলাদাভাবে ওর সঙ্গে দেখা করলাম এবং ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যে ওর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চাপ দিলাম তখন ও থরথর করে কাঁপছিল। ওর এই উষ্ণ কম্পন ওর উজ্জ্বল মুখের চেয়েও উত্তপ্ত ছিল। ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। ওর দু' চোখে উৎসাহ-দীপ্ত ভাবনার দমক ছাড়াও এক শ্রান্ত চাহনি আমি দেখতে পেলাম—যেন ও

কাউকে খ‍ুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার হাত থেকে নিজের হাতকে ছাড়িয়ে নিয়ে ও চামেলি ঝাড়ের নিচে এগিয়ে গেল।

চামেলি ঝাড়ের কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পরনে সাদা ধবধবে খদ্দরের শাড়ি।

পরের দিন আমি ব‍ুঝতে পারলাম শাহজাদা গ‍ুলাম আলী প্রেমের ফাঁদে আটকা পড়েছে। আমি যে মেয়েটিকে চামেলি ঝাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম তার সঙ্গে ও প্রেমে করছিল। এ এক তরফা প্রেম ছিল না, নিগারও ওর প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছিল। নিগার নাম থেকে বোঝা যায় সে ছিল ম‍ুসলমান। অনাথ। মেয়েদের হাসপাতালে নার্সের কাজ করত, খ‍ুব সম্ভব অম‍ৃতসরে প্রথম ম‍ুসলমান মেয়ে, যে বোরখা ফেলে দিয়ে কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

খদ্দরের কাপড় পরে, কিছ‍ুটা কংগ্রেসের সরগরমে যোগ দেওয়াতে এবং হাসপাতালে কাজ করার দর‍ুন নিগারের ইসলামী প্রকৃতি অর্থাৎ সেই উগ্র জিনিস যা ম‍ুসলমান মেয়েদের স্বভাবে লীন হয়ে আছে তা কিছ‍ুটা পরিমাণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল—কিছ‍ুটা নম্র হয়ে গিয়েছিল।

দেখতে ও স‍ুন্দর ছিল না, কিন্তু নারীত্বের অনিন্দ্যস‍ুন্দরতা নম্রতা ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধায় ও ছিল ভরপ‍ুর। আদর্শ হিন্দ‍ু মেয়েদের যে স্বভাব তা নিগারের মধ্যে অল্প-বিস্তর ঝিলিক দিচ্ছিল এবং যা তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে রক্তের উষ্ণতা সঞ্চার করার জন্যে রঙ ভরে দিয়েছিল। খ‍ুব সম্ভব নিগারকে নিয়ে আমি সেই সময় এমন করে ভাবিনি। কিন্তু এখন লেখার সময় যখন আমি নিগারকে নিয়ে কল্পনা করছি তখন ওকে নমাজ আর আরতীর এক হৃদয়-সঙ্গম বলে আমার মনে হচ্ছে।

ও শাহজাদা গ‍ুলাম আলীর প‍ূজো করত আর শাহজাদা ওর জন্যে জান দিয়ে দিত। নিগারকে নিয়ে আমি যখন ওর সঙ্গে কথা বলি তখন জানতে পারি কংগ্রেসের আন্দোলনের জন্যে ওদের দ‍ুজনের পরিচয় হয়। আর পরিচয়ের অল্প দিনের মধ্যে ওরা দ‍ুজন জনের হয়ে যায়।

গ‍ুলাম আলীর ইচ্ছা ছিল জেলে যাওয়ার আগে ও নিগারকে বিয়ে করে। আমার এখন ঠিক মনে নেই, জেলে যাওয়ার আগে ও কেন বিয়ে করতে চেয়েছিল। জেল থেকে ফিরে এসেও তো বিয়ে করতে পারত। সেই সময় তো খ‍ুব বেশী দিন জেল হত না। খ‍ুব কম হলে তিন মাস আর বেশী

হলে এক বৎসর। অনেককে তো পনেরো-বিশ দিন পরেই ছেড়ে দেওয়া হত, যাতে অন্য কয়েদীদের জায়গার অভাব না হয়। যাই হোক ওর নিজের ইচ্ছা নিগারের ওপরও প্রভাব ফেলেছিল এবং নিগারও সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল। শুধু মাত্র বাবাজীর কাছে গিয়ে আশীর্বাদ নেওয়াটাই বাকী ছিল।

বাবাজী সম্পর্কে আপনি যাই জানুন না কেন, তাঁর ছিল অসাধারণ ক্ষমতা। শহরের বাইরে লাখপতি সরাফ হরিরামের জাঁকজমক বাড়িতে তিনি উঠতেন। পাশের এক গ্রামে তিনি যে আশ্রম করেছিলেন সাধারণত সেখানেই থাকতেন, কিন্তু অমৃতসরে এলে তিনি হরিরাম সরাফের বাড়িতে থাকতেন। আর বাবাজী এলেই তাঁর ভক্তদের কাছে এই বাড়ি পবিত্র হয়ে উঠত। সারাদিন দর্শন প্রার্থীদের ভিড়ে জমজমাট থাকত। প্রতিদিন বিকালের দিকে আমগাছের শীতল ছায়ায় একটা বেঞ্চের ওপর বসে তিনি জনসাধারণকে দর্শন দিতেন এবং আশ্রমের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করতেন। তারপর ভজন ইত্যাদি শুনে প্রতিদিন তাঁর মতামত নিয়ে এই সভা ভেঙে দেওয়া হত।

বাবাজী খুব পরোপকারী ঈশ্বর বিশ্বাসী, বিদ্বান এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দু মুসলমান শিখ এবং অচ্ছুৎ—প্রত্যেকেই তাঁকে মান্য করত এবং নিজেদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

রাজনীতির ব্যাপারে বাবাজীর কোন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু সবাই জানত পাঞ্জাবের সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁরই ইচ্ছায় শুরু হত এবং তাঁরই ইচ্ছায় খতম হত।

সরকারের কাছেও এই ব্যাপারটা ছিল অস্পষ্ট। এ এমন এক রাজনৈতিক চাল ছিল যে ব্রিটিশ সরকারের বড় বড় রাজনীতিকরাও এর কারণ খুঁজে পায়নি। বাবাজীর পাতলা-পাতলা ঠোঁটের একঝলক হাসির হাজার রকম অর্থ হত। কিন্তু তিনি যখন স্বয়ং সেই হাসির এক নতুন অর্থ ব্যাখ্যা করতেন তখন ভক্ত-জনরা আরও বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়ত।

অমৃতসরে এই যে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল এবং ঝপাঝপ গ্রেফতার হচ্ছিল এর পেছনে আর যাই-ই থাক বাবাজীর ইচ্ছাই যে কাজ করছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তিনি যখন জনসাধারণকে দর্শন দিতেন তখন তিনি সারা পাঞ্জাবের আন্দোলনকে এবং সরকারের নিত্য নতুন কঠোরতা সম্পর্কে ফোঁকলা মুখে ছোট্ট—খুব ছোট্ট একটা শব্দ

ছুঁড়ে দিতেন। আর হোমরা-চোমরা নেতারা সঙ্গে সঙ্গে তা নিজেদের গলায় তাবিজ করে ঝুলিয়ে দিতেন।

লোকে বলত; তাঁর চোখে চুম্বকের মতো এক অসাধারণ শক্তি ছিল। তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল যাদু। তাঁর মস্তিষ্ক এত ঠান্ডা এবং উপস্থিত বুদ্ধিতে ঠাসা ছিল যে, তাঁকে অশ্লীল থেকে অশ্লীলতর গালিগালাজ আর তীক্ষ্ম থেকে তীক্ষ্মতম ব্যঙ্গ করলেও মুহূর্তের জন্যেও তিনি উত্তেজিত হতেন না। বিরোধীদের কাছে তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ ছিল এক প্রচন্ড ত্রাসের জিনিস। অমৃতসরে বাবাজীর অনেক মিছিল বের হয়েছিল। কিন্তু আমিই বোধহয় একমাত্র মানুষ ছিলাম, যে অনেক নেতাকে দেখেছিলাম, একমাত্র তাঁকেই দূর থেকে বা কাছে থেকে দেখিনি। তাই যখন গুলাম আলী তাঁকে দর্শন করার জন্যে এবং বিয়ের ব্যাপারে তাঁর মতামত নেওয়ার কথা আমাকে বলল, তখন আমি তাকে বললাম তাদের দুজনের সঙ্গে আমিও যাব।

বাবাজী স্নান-টান সেরে এবং ভোরের প্রার্থনা শেষ করে এক সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যার কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত শুনছিলেন। চীনা মাটির সাদা ধবধবে টাইল বসানো মেঝের ওপর খেজুরের চাটাই বিছিয়ে বাবাজী বসে ছিলেন। এক ধারে পাশ বালিশ পড়ে ছিল। কিন্তু সেই পাশ বালিশে তিনি হেলান দেননি।

বাবাজী যে চাটায়ের ওপর বসে ছিলেন সেই চাটাই ছাড়া ঘরে আর কোন ফার্নিচার ছিল না। ঘরের এক কোণ থেকে আরেক কোণ পর্যন্ত সাদা টাইলগুলো ঝকঝক করছিল। যে ব্রাহ্মণ কন্যা জাতীয় সঙ্গীত গাইছিল তার হাল্কা গোলাপী মুখশ্রীকে এই টাইলগুলোর ঝকমক আরও সুন্দর করে তুলেছিল।

বাবাজীর বয়স কম পক্ষে সত্তর-বাহাত্তর হবে। এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও (তিনি গেরুয়া রঙের একটা ছোট লুঙ্গি পরেছিলেন) বয়সের কোন ছাপ তাঁর ওপর পড়েনি। তাঁর শরীরে এক অদ্ভুত ধরনের ঔজ্জ্বল্য এবং লাবণ্য ছিল। পরে আমি জানতে প্যার প্রতিদিন স্নান করার আগে সারা গায়ে তিনি অলিবয়েল মালিশ করতেন।

শাহজাদা গুলাম আলীর দিকে তাকিয়ে তিনি মুচকি হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকেও এক ঝলক তাকালেন। এবং আমাদের তিন জনের

সেলামের উত্তরে তিনি তেমনি মুচকি হেসে ইশারায় আমাদের বসতে বললেন।

চেতনার চশমায় আমি যখন সেই ছবি সামনে আনতাম তখন মজার ব্যাপার না হয়ে বরং ভাবনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। খেজুরের চাটাই-এর ওপর এক অর্ধনগ্ন বৃদ্ধ যোগীর মতো বসে আছেন। তাঁর বসার ঢঙ, তাঁর টাক মাথা, তাঁর অর্ধ নিমীলিত চোখ, তাঁর শ্যামবর্ণ মসৃণ শরীর, তাঁর দেহের প্রতিটি শিরা থেকে এমন এক শান্তিতে ভরপুর সন্তোষ—এক নিশ্চিত বিশ্বাস জাহির হচ্ছিল যে, দুনিয়া তাঁকে যেখানে বসিয়েছে সেখান থেকে কোন ভূমিকম্পই ছিটকে ফেলে দিতে পারবে না।

আর তাঁর কাছ থেকে সামান্য কিছুটা দূরে ফুটে ছিল কাশ্মীরের এক পাহাড়ী কলি। কিছুটা সেই প্রবীণের নৈকট্যকে সম্মান দেওয়ার জন্যে, কিছুটা জাতীয় সঙ্গীত আর কিছুটা নিজের ভরাট যৌবনের জন্যে সে ঝুঁকে ছিল। জাতীয় সঙ্গীত ছাড়াও শাদা শাড়ির ভেতর থেকে সে তার যৌবনের সঙ্গীতকে উচ্চগ্রামে গাইতে চাইছিল। যে ভরাট যৌবন এই প্রবীণের নৈকট্যকে আপ্যায়িত করার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ তার যৌবনের শক্তি সংকার করার জন্যে অবনত হতে চাইছিল—সেই যৌবন তাকে ঘাড় ধরে জীবনের দাউ দাউ আগুনে লাফিয়ে পড়ার জন্যে উৎসাহ যোগাচ্ছিল। তার হাল্কা গোলাপী চেহারা থেকে, তার বড় বড় কালো চঞ্চল চোখ থেকে, তার খদ্দরের খসখসে ব্লাউজে-ঢাকা উচ্ছলিত বুক থেকে সেই বৃদ্ধ যোগীর গভীর বিশ্বাস এবং সন্তোষের বিরুদ্ধে এক নীরব আর্তনাদ উচ্চারিত হচ্ছিল। যেন বলেছিল, এস, আমি এখন যেখানে আছি সেখান থেকে আমাকে টেনে নীচে নামাও, না হয় আমাকে ওপরে নিয়ে চল।

আমরা তিনজন একধারে সরে বসেছিলাম—আমি নিগার আর শাহজাদা গুলাম আলী। আমি চুপচাপ বোকার মতো বসে ছিলাম। বাবাজীর ব্যক্তিত্বে যেমন আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম, তেমনি ব্রাহ্মণ কন্যার অনন্য সৌন্দর্যেও। মেঝের ঝকমকে টাইলগুলো এবং তার ওপর বিছানো খসখসে চাটাইও আমাকে আকর্ষিত করেছিল। একেকবার মনে হচ্ছিল এই রকম একটা টাইল-বসানো বাড়ি যদি আমি পেতাম তাহলে কত ভালোই না হত।

একেকবার মনে হচ্ছিল এই ব্রাহ্মণ কন্যা আমাকে আর কিছু করতে না না দিক অন্তত একবার তার চোখের ওপর আমার চুম্বনের স্পর্শ নিক।

এই ইচ্ছা আমার সমস্ত শরীরে এক থরথর কম্পন সৃষ্টি করল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়ির ঝির কথা মনে হল, যার সঙ্গে আমার 'সেই' সম্পর্ক এখনও সজীব হয়ে আছে। মনে হচ্ছিল ওদের দু'জনকে এখানে ফেলে রেখে আমি সোজা বাড়ি যাই, আর সবার নজর বাঁচিয়ে ওকে ওপরের বাথরুমে নিয়ে গিয়ে…কিন্তু যখন বাবাজীর দিকে তাকালাম এবং কানে জাতীয় সঙ্গীতের উদ্দীপক শব্দ গুঞ্জরিত হয়ে উঠল তখন অন্য আরেক ধরনের কম্পন আমার মধ্যে শুরু হল। মনে হল কোথাও থেকে যদি একটা পিস্তল পেয়ে যাই তবে সিভিল লাইনসে গিয়ে ইংরেজদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।

আমার মতো এই বন্ধুর পাশেই নিগার আর শাহজাদা বসেছিল। ভালোবাসার দুটি হৃদয়—ভালোবাসায় একাকীত্ব হাঁফাতে হাঁফাতে খুব সম্ভব এখন উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। আর তাই তারা তাড়াতাড়ি একজন আর একজনের প্রেমের রঙ দেখার জন্যে এক হয়ে যেতে চাইছিল। অন্য ভাষায় বলা যায়, তারা তাদের একমাত্র রাজনৈতিক পিতা বাবাজীর কাছ থেকে বিয়ে করার জন্যে অনুমতি নিতে এসেছিল। ওপর ওপর আর যাই থাক তাদের দুজনের মনে সেই সময় রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতের জায়গায় তাদের জীবনের সুন্দরতম এক অশ্রুত সঙ্গীত গুনগুন করছিল।

সঙ্গীত শেষ হলে বাবাজী খুব স্নেহ বিগলিত ঢঙে ব্রাহ্মণ কন্যাকে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। এবং মুচকি হেসে নিগার এবং গুলাম আলীর দিকে তাকালেন। আমাকেও এক ঝলক তাকিয়ে দেখে নিলেন।

খুব সম্ভব পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে গুলাম আলী নিগারের নাম বলতে চাইছিল। কিন্তু তার আগেই বাবাজী মিষ্টি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "শাহজাদা, তুমি এখনও গ্রেফতার হওনি ?"

গুলাম আলী হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে না।"

বাবাজী কলমদানী থেকে একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে লিখতে লিখতে বললেন, "কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি গ্রেফতার হয়ে গিয়েছ।"

গুলাম আলী তার এই কথার অর্থ ঠিক ধরতে পারল না। বাবাজী এক ঝলক ব্রাহ্মণীর দিকে তাকিয়ে নিগারের দিকে ইশারা করে বললেন, 'নিগার আমাদের শাহজাদাকে গ্রেফতার করে ফেলেছে।"

লজ্জায় নিগার লাল হয়ে উঠল। গুলাম আলী আশ্চর্যে হা হয়ে রইল, আর বাহ্মণীর গোলাপী মুখের ওপর আশীর্বাদ-ভরা এক চমক খেলে গেল।

ও গ্লোম আলী আর নিগারের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন সেই তাকানোর অর্থ ভালোই হয়েছে।

বাবাজী আর একবার ব্রাহ্মণীর দিকে তাকালেন। এবং বললেন, "এরা আমার কাছে বিয়ের অনুমতি নিতে এসেছে—কমল, তুমি কবে বিয়ে করছ ?"

জানলাম ব্রাহ্মণীর নাম কমল। হঠাৎ বাবাজীর প্রশ্ন শুনে ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। ওর গোলাপী মুখ ম্লান হয়ে গেল। কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে ও বলল, "আমি তো আপনার আশ্রমে যাচ্ছি।"

কমলের এই উত্তরের মধ্যে কেমন একটা করুণভাব জড়িয়ে ছিল। যে করুণতা—ব্যথা বাবাজীর হুশিয়ার মন সঙ্গে সঙ্গে নোট করে নিল। ওর দিকে তাকিয়ে বাবাজী যোগীর মতো একটু মুচকি হাসলেন। হেসে গুলাম আলী আর নিগারকে বললেন, "তা তোমরা দুজনে সব ঠিক করে ফেলেছ ?"

দুজনে অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিল, "জী হাঁ।"

বাবাজী ভাসাভাসা চোখে তাদের দিকে তাকালেন, "মানুষ যেমন ফরসালাও করতে পারে তেমনি তা আবার পালটাতেও পারে।"

এই প্রথম গুলাম আলী বাবাজীর গম্ভীর অটলতার বিরুদ্ধে—না, গুলাম আলী নয়, তার দৃঢ় এবং সমগ্র কণ্ঠে উত্তর দিল, "যদি এই ফরসালা কোন কারণে পালটানো হয় তবুও আমি আমার জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব।"

বাবাজী তাঁর চোখ বন্ধ করে যেন মহাশূন্যের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ?"

এই প্রশ্নে গুলাম আলী একটুও ঘাবড়াল না। নিগারের সঙ্গে তার যে সাচ্চা প্রেম ছিল তা যেন বলে উঠল, "বাবাজী, আমি হিন্দুস্থানে আজাদী আনার জন্যে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা যদি কোন কারণে মুলতবি রাখার চেষ্টা হয় তাতে কি আসে যায়, আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা তো নড়চড় হবার নয়।"

যেহেতু আমি সেখানে বসেছিলাম তাই বাবাজী এই বিয়ে নিয়ে তর্ক করা উচিত মনে করলেন না। তিনি হেসে দিলেন। তাঁর এই হাসিও তাঁর অন্য হাসিরই মতো। যে হাসির মানে একেক জন একেক ভাবে অর্থ করবে।

যদি বাবাজীকে এই হাসির অর্থ জিজ্ঞেস করা হত আমার বিশ্বাস তবে তিনি আমাদের প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন অর্থ এক করে দিতেন।

এই হাজারো অর্থ-ভরা মুচকি হাসি নিজের পাতলা পাতলা ঠোঁটের ওপর আর একটু প্রসারিত করে বাবাজী নিগারকে বললেন, "নিগার তুমি আমার আশ্রমে আস, অল্প দিনের মধ্যেই শাহজাদা গ্রেফতার হয়ে যাবে।"

নিগার মৃদু কণ্ঠে বলল, "জী আচ্ছা।"

এরপর বাবাজী বিয়ের কথা আর না তুলে জালিয়ানওয়ালাবাগের কাম্পের যে সরগরম সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে গুলাম আলী নিগার আর কমল গ্রেফতার মুক্তি দুধের লস্যি এবং তরি-তরকারি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। আর আমি বেকুবের মতো চুপচাপ বসে ভাবছিলাম বাবাজী বিয়ের অনুমতি দিতে এত কুণ্ঠিত কেন! গুলাম আলী আর নিগারের ভালোবাসাকে কি বাবাজী সন্দেহের চোখে দেখেন? গুলাম আলীর সত্তার ওপর তাঁর কি সন্দেহ আছে? নিগারকে কি তিনি তাঁর আশ্রমে এই জন্যেই আমন্ত্রিত করছেন যে ঐখানে থাকলে সে তার স্বামীকে—যে গ্রেফতার হতে চলেছে তাকে ভুলে যাবে?......কিন্তু বাবাজী কমলকে কেন জিজ্ঞেস করলেন, "কমল তুমি কবে বিয়ে করছ?" কমল কেন বলল,—"আমি আপনার আশ্রমে যাচ্ছি।"

কেন আশ্রমে কি নারী এবং পুরুষ বিয়ে করে না? আমার মন এক অদ্ভুত সমস্যায় ফেঁসে গেল। সেখানে এই ধরনের কোন্ ব্যাপার আছে যে, পাঁচ শ' স্বয়ংসেবকের জন্যে স্বয়ংসেবিকারা চাপাটি তৈরী করে? ক'টা উনুন আছে? আর তা কত বড়? কেন এমন কি হতে পারে না, বিরাট একটা উনুন বানিয়ে তার ওপর বিরাট এক তাওয়া রেখে ছ'জন স্বয়ংসেবিকা একই সঙ্গে রুটি বানায়?

আমি ভাবছিলাম ব্রাহ্মণ কন্যা কমল আশ্রমে গিয়ে কি শুধু বাবাজীকে জাতীয় সঙ্গীত এবং ভজন শোনাবে? আমি আশ্রমে পুরুষ স্বয়ংসেবক দেখেছি। তারা প্রত্যেকে সেখানকার কায়দা অনুযায়ী 'স্নান' করত, ভোরে ঘুম থেকে উঠে দাতন করত, বাইরের খোলা হাওয়াতে থাকত, ভজন গাইত, তবু তাদের জামা-কাপড় থেকে ঘামের গন্ধও আসত। অনেকের দাঁতে আবার বিশ্রী গন্ধ। আর খোলা হাওয়ায় থাকার দরুণ মানুষের মধ্যে যে খুশী-খুশী ভাব দেখা যায় তা তাদের মধ্যে একেবারেই দেখা

যেত না।

বেঁকে যাওয়া, পাংশু মুখ, গর্তে-বসা চোখ, ভীরু ভীরু চেহারা—গরুর নিংরানো বাটের মতো চুপসে-যাওয়া আশ্রমের এই নিষ্প্রাণ লোকগুলিকে আমি কয়েকবার জালিয়ানওয়ালাবাগে দেখেছি। বারবার মনে হয়েছে এরা কি ধরনের মরদ যাদের গা থেকে ঘামের দুর্গন্ধ আসে! আর এই ব্রাহ্মণী, যার শরীর দুধ মধু এবং কেশর খেয়ে তৈরী,—তাকে এই মানুষগুলি পিচুটি-ভরা চোখে চাটবে! এরা কি ধরনের মরদ যারা তাদের মুখের কটু গন্ধ নিয়ে সুগন্ধে ভরপুর এই সব নারীদের সঙ্গে কথা বলবে? কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, না, হয়তো হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা এই সব জিনিসের অনেক, অনেক ওপরে।

আমি এই 'হয়তো' দেশভক্তি এবং আজাদীকে আমার সমস্ত চেতনা দিয়েও ঠিক বুঝতে পারিনি, কারণ আমি নিগারের কথা ভাবছিলাম। নিগার আমার পাশে বসে বাবাজীকে বলছিল, শালগম সেদ্ধ হতে দেরী লাগে। কোথায় শালগম আর কোথায় বিয়ে, যে বিয়ের জন্যে ও আর গুলাম আলী তাঁর কাছে অনুমতি নিতে এসেছিল।

আমি নিগার এবং আশ্রম সম্পর্কে ভাবছিলাম। আশ্রম আমি দেখিনি, কিন্তু আশ্রম স্কুল জমায়েতখানা তীর্থস্থান দরগাহ প্রভৃতি সম্পর্কে আমার বিরূপতা আছে। কেন তা আমি জানি না।

আমি কয়েকটি অন্ধ স্কুল, অনাথ আশ্রমের ছেলে এবং সেখানকার পরিচালকদের দেখেছি। রাস্তার ওপর তাদের সার বেঁধে ভিক্ষা করতে দেখেছি। জমায়েতখানা আর দরগাহ দেখেছি। দেখেছি তাদের হাঁটুর ওপর ওঠানো পায়জামা। ছোটদের মাথার ওপর বড় বড় মেহরা, আর যারা বয়সে বড় তাদের মুখে এক রাশ ঘন দাড়ি, যে দাড়ি ক্রমে বেড়েই চলেছে। আর গালের ওপর মোটা মোটা মোলায়েম চুল। নমাজ পড়তে চলেছে। মুখের ওপর কেমন একটা নিষ্ঠুর ভাব, যে নিষ্ঠুর ভাব সহজেই চোখে পড়ে।

নিগার ছিল নারী। হিন্দু মুসলমান শিখ বা খ্রীস্টান নারী নয়—ও ছিল শুধুমাত্র নারী। না, ও ছিল নারীর প্রার্থনা, যে প্রার্থনা সাচ্চা হৃদয়ে পেতে চায় তাকে, যে তাকে ভালোবাসে আর যাকে সে নিজে চায়।

আমার মাথায় ঢুকছিল না বাবাজীর আশ্রমে,—যেখানে প্রতিদিন এক

বিশেষ ঢঙে প্রার্থনা হয়, সেখানে এই মেয়েরা কেমন করে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করবে। কারণ যারা নিজেরাই এক একটি প্রার্থনা।

আমি এখন যখন বাবাজী নিগার গুলাম আলী ব্রাহ্মণী আর অমৃতসরের সেই পরিবেশ, যা স্বাধীনতা আন্দোলনের এক রঙীন নেশায় মেতেছিল ভাবি, তখন তা স্বপ্ন বলে মনে হয়। এমন এক স্বপ্ন, যে স্বপ্ন একবার দেখলে আর একবার দেখার জন্যে মন আকুল হয়ে ওঠে।

বাবাজীর আশ্রম আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি, কিন্তু যে বিরূপ ধারনা আমার আগে ছিল তা এখনও আছে।

এ সেই জায়গা যেখানে দুর্ভাগ্যকে সম্বল করে মানুষ এক সারিতে হেঁটে চলে। আমার কাছে এর কোন দাম আছে বলে মনে হয়নি। আজাদী নিশ্চয়ই লাভ করতে হবে। আর তা লাভ করার জন্যে যারা প্রাণ দান করে তাদের আমি বুঝতে পারি। কিন্তু তার জন্যে সেই হতভাগাদের যদি তরকারির মতো ঠাণ্ডা এবং নির্জীব বানানো হয়, তবে তাকে আমি কি বলব? এ আমার বুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে।

ঝুপরিতে থাকা, আরাম আয়েশের বদলে কঠিন পরিশ্রম করা, ভগবানের গুন-কীর্তন করা, জাতীয় শ্লোগান দেওয়া—এ সমস্ত কিছুই নিশ্চয়ই সঠিক। কিন্তু মানুষের যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য এবং ভালোবাসা-বোধ তাকে ধীরে ধীরে হত্যা করা কেমন ব্যাপার! এরা কেমন মানুষ যাদের মধ্যে সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার ছটফটানি নেই! এ ধরনের আশ্রম মাদ্রাসা আর স্কুলের সঙ্গে মুলোর খেতের পার্থক্য কোথায়?

বাবাজী অনেকক্ষণ ধরে গুলাম আলী এবং নিগারের সঙ্গে জালিয়ানওয়ালাবাগের সরগরম নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। তারপর তিনি, যারা তাদের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যায়নি সেই ভালোবাসার যোটক—গুলাম অলৌ আর নিগারকে বললেন, পরের দিন তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগে যাবেন, আর তাদের স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা দেবেন।

গুলাম আলী আর নিগার খুব খুশী হয়েছিল। এর চেয়ে বেশী তাদের আর কি সৌভাগ্য হতে পারে! কারণ বাবাজী স্বয়ং তাদের বিয়েতে অংশ নেবেন। গুলাম আলী আমাকে পরে বলেছিল ও এত খুশী হয়েছিল যে, যে মুহূর্তে ও এ কথা শুনল, মনে হচ্ছিল যেন ভুল শুনছে। কারণ বাবাজীর সরু সরু টেরা-বেঁকা হাতের আলতো স্পর্শও এক ঐতিহাসিক

ঘটনায় পরিণতি হত। এত বড় একজন শক্তিধর মানুষ, যিনি শুধু মাত্র ঘটনার সংযোগে কংগ্রেসের ডিকটেটর হয়েছেন, তিনি একজন সাধারণ মানুষের জন্যে জালিয়ানওয়ালাবাগে যাবেন—তার বিয়েতে অংশগ্রহণ করবেন। এ ঘটনা ভারতবর্ষের সমস্ত পত্র-পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় লাল অক্ষরে লেখা থাকবে।

সন্ধ্যা ছ'টায় যখন জালিয়ানওয়ালাবাগের নাইট কুইন ফুলের ঝাড়গুলো তার গন্ধকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে উসখুস করছিল, আর স্বয়ংসেবকরা যখন বর কনের জন্যে একটি ছোট্ট সামিয়ানা খাটিয়ে চামেলি গাঁদা এবং গোলাপ দিয়ে সাজাচ্ছিল তখন বাবাজী জাতীয় সঙ্গীতের গায়িকা সেই ব্রাহ্মণী, তাঁর সেক্রেটারী এবং লালা হরিরাম সরাফের সঙ্গে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এলেন। সদর ফটকের কাছে হরিরামের গাড়ি এসে যখন থামল শুধুমাত্র তখনই সবাই জানতে পারল তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগে এসেছেন।

আমিও সেখান ছিলাম। স্বয়ংসেবিকারা অন্য আর একটা তাঁবুতে নিগারকে সাজাচ্ছিল। গুলাম আলী তেমন কোন সাজ-সজ্জা করেনি। সারাদিন সে শহরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে স্বয়ংসেবকদের খাবার-দাবার নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। কথাবার্তা শেষ হয়ে গেলে এক মুহূর্তের জন্যে সে নিগারের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলল। তারপর যতটুকু আমি জানি সে তার ওপরতলার কর্মকর্তাদের শুধু বলল, বিয়ের পার্বন শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আর নিগার দুজনে ঝাণ্ডা তুলে ধরবে।

বাবাজীর আসার খবর যখন গুলাম আলী পেল তখন সে কুয়োর কাছে দাঁড়িয়েছিল। খুব সম্ভব সেই সময় আমি তাকে বলেছিলাম, গুলাম আলী তুমি কি জান, যখন জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চলে ছিল তখন এ কুয়ো মৃতদেহে ভরে গিয়েছিল। আজকে সবাই এর জল পান করে।—এর জল দিয়েই এই বাগানের সমস্ত ফুল গাছ সিঞ্চন করা হয়। মানুষ এখানে এসে সেই ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যায়। জলের একটি ফোটাতেও রক্তের নোনা স্বাদ নেই, ফুলের একটি পাঁপড়িতেও রক্তের লালিমা নেই—এ কেমন কথা?

আমার বেশ মনে আছে, শাহজাদাকে এই কথাকটি বলে আমি সেই বাড়ির জানালার দিকে তাকালাম। বলা হয় এই বাড়ির জানালার কাছে বসে ন' বছরের এক কিশোরী মজা দেখছিল। মজা দেখতে দেখতেই জেনারেল ডায়ারের গুলিতে সে বিদ্ধ হয়েছিল। তার বুক থেকে প্রবাহিত

সেই রক্তের ধারা আজ পুরানো প্রাচীরের ওপর ম্লান হয়ে চলেছে।

এখন রক্ত এত শস্তা হয়ে গিয়েছে যে, রক্ত দেওয়া আর নেওয়া কোন কঠিন ব্যাপার নয়। আমার মনে আছে তখন আমি তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। জালিয়ানওয়ালাবাগের এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ছ-সাত মাস পর আমাদের মাস্টার মশায় ক্লাশের সমস্ত ছেলেদের সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় জালিয়ানওয়ালাবাগ বাগান ছিল না—ছিল উজাড়, নিস্তব্ধ। আর উঁচু-নীচু এক টুকরো জমি—যে জমিতে মাটির ছোট-বড় ঢেলায় হোঁচট খেতে যেতে আমরা এগুচ্ছিলাম। হঠাৎ মাটির ছোট্ট একটি ঢেলায় খুব সম্ভব পানের পিকের বা অন্য কিছুর ছোপ দেখে আমাদের মাস্টার মশায় সেই ঢেলাটা উঠিয়ে নিয়ে বললেন, 'দেখ, এর ওপর এখনও আমাদের শহীদদের রক্তের দাগ লেগে আছে।'

এই কাহিনী যখন লিখে চলেছি তখন আমার স্মৃতির পর্দায় অসংখ্য ছোট-ছোট কথা এসে ভিড় করছে। কিন্তু আমাকে তো নিগার আর গুলাম আলীর বিয়ের কাহিনী বলতে হবে।

গুলাম আলী যখন খবর পেল বাবাজী এসে গিয়েছেন, তখন সে দৌড়ে সমস্ত স্বয়ংসেবকদের একত্রিত করল। তারা ফৌজি ঢঙ-এ বাবাজীকে সেলুট করল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তিনি আর গুলাম আলী সমস্ত ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। এর মধ্যে বাবাজী, যাঁর বিনোদ-প্রিয়তা সম্পর্কে সবাই জানত, তিনি স্বয়ংসেবিকা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় দু-চারটি হাসির কথাও বললেন।

আশ-পাশে বাড়িগুলোতে যখন আলো জ্বলে উঠতে লাগল এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ অস্পষ্ট অন্ধকারে ছেয়ে গেল তখন স্বয়ংসেবিকারা একসঙ্গে ভজন গাইতে শুরু করে দিল। কয়েকজনের কণ্ঠ সুরেলা ছিল, বাকী সবার বেসুরো। কিন্তু মিলিত এই সুরের পরিবেশ খুব সুন্দর ছিল। বাবাজী চোখ বন্ধ করে শুনছিলেন। কম করেও হাজারখানেক মানুষ চত্তরের চারদিকে মাটিতে বসে ছিল। ভজন যারা গাইছিল সেই সব মেয়েরা ছাড়া আর সবাই চুপ ছিল। ভজন শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা নিশ্চুপতা ছেয়ে ছিল। যে নিশ্চুপতা ভেঙে যাওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। বাবাজী তখন চোখ খুলে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি কণ্ঠে বললেন, "তোমারা নিশ্চয়ই জান, আজ আমি এখানে এসেছি আজাদীর দুই

দেওয়ানাকে এক করার জন্যে।" বলার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাগ আনন্দে গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

কনে সেজে নিগার চত্তরের এক কোণে মাথা নত করে বসেছিল। খদ্দরের তেরঙা শাড়িতে ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। বাবাজী ইশারা করে ওকে ডেকে গুলাম আলীর পাশে বসিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে জনতা খুশীতে শ্লোগান দিতে লাগল।

গুলাম আলীর মুখ অস্বাভাবিক লাল হয়ে উঠল। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, এক বন্ধুর হাত থেকে বিয়ের কাগজ নিয়ে সে যখন তা বাবাজীর হাতে দিচ্ছিল তখন তার হাত থরথর করে কাঁপছিল।

চত্তরে একজন মৌলভী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। কোরাণ থেকে তিনি কয়েকটি বয়াত পড়লেন, যে বয়াতগুলি সাধারণত বিয়ের সময় পড়া হয়। বাবাজী চোখ বন্ধ করে নিলেন। নিকার পর্ব শেষ হয়ে গেলে বাবাজী তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বর কনেকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর চারদিক থেকে যখন ছুহারা বর্ষণ হতে লাগল তখন তিনি শিশুর মতো ঝাঁপ দিয়ে দশ পনেরোটা ছুহারা কুড়িয়ে পাশে রাখলেন।

নিগারের এক হিন্দু বান্ধবী লাজুক হেসে গুলাম আলীকে একটা ছোট্ট কৌটো দিয়ে কি যেন বলল। গুলাম আলী কৌটো খুলে নিগারের সাদা সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে ভরিয়ে দিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তিম পরিবেশ আর একবার জোর জোর তালির আওয়াজে ভরে উঠল।

এই তালির আওয়াজের মধ্যে বাবাজী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

নাইট কুইন আর চামেলির সোঁদা সোঁদা গন্ধ মিলে মিশে সন্ধ্যার ফুর-ফুরে হাওয়ায় নাচছিল। খুব মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বাবাজীর কণ্ঠ আজ আরও মিষ্টি ছিল। গুলাম আলী আর নিগারের বিয়েতে বাবাজী নিজের হৃদয় আরও খুশীতে ভরিয়ে তোলার পর বললেন, "এই দুটি তরুণ-তরুণী আগের চেয়ে আরও বেশী উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে তাদের দেশ এবং জাতির সেবা করবে। কারণ বিয়ের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী এবং পুরুষের সত্যিকারের বন্ধুত্ব। তারা—নিগার আর গুলাম আলী পরস্পরের বন্ধু—এক অভিন্ন হৃদয় হয়ে স্বরাজের জন্যে কাজ করতে পারে। ইউরোপে এ রকম কিছু বিয়ে হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্ধুত্ব—

শুধু মাত্র বন্ধুত্ব। এই ধরনের মানুষই ইজ্জতের যোগ্য। কারণ তারা জীবন থেকে কাম-বাসনাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।"

বাবাজী অনেকক্ষণ ধরে বিয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে লাগলেন। তাঁর বিশ্বাস, বিয়ের সত্যিকারের আনন্দ তখনই উপভোগ করা সম্ভব যখন নারী এবং পুরুষের মধ্যে শুধুমাত্র দৈহিক সম্পর্কই থাকে না। পুরুষ আর নারীর দৈহিক সম্পর্ক তাঁর কাছে তত বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, যা সাধারণত ভাবা হয়ে থাকে। হাজার হাজার মানুষ জিভের স্বাদ নেওয়ার জন্যেই খায়। তার মানে, এই স্বাদ গ্রহণ করাই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। খুব কম লোকই আছে যারা শুধু বেঁচে থাকার জন্যে খায়। আসলে তারাই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কায়দা জানে। ঠিক সেই রকম এই ধরনের মানুষই বিয়ের পবিত্র ভাবনার বাস্তবিকতা এবং সম্পর্কের পবিত্রতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে দাম্পত্য-জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

বাবাজী তাঁর নিজের এই বিশ্বাসকে অনেকটা এমনি ভাবে উপলব্ধি করেন। তাই তিনি মনকে স্পর্শ করে এমন কোমল ভাবনার সাহায্যে যখন তাঁর বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করলেন তখন শ্রোতাদের কাছে সম্পূর্ণ এক নতুন দুনিয়ার দরজা খুলে গেল। আমি নিজেই খুব প্রভাবিত হলাম। গুলাম আলী আমার সামনে বসেছিল। সে বাবাজীর ভাষণের প্রতিটি শব্দকে যেন পান করছিল। বাবাজী যখন ভাষণ বন্ধ করলেন তখন গুলাম আলী নিগারকে কি যেন বলল। তারপর সে উঠে কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বলল ঃ

"আমার আর নিগারের বিয়ে এমন এক আদর্শ বিয়ে, যতদিন হিন্দুস্তানে স্বরাজ না আসবে, ততদিন আমার আম নিগারের সম্পর্ক হবে বন্ধুর মতো।"

জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তিম পরিবেশ বহুক্ষণ ধরে বেপরওয়া তালির শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল। শাহাজাদা গুলাম আলী ভাবুক হয়ে উঠল। তার কাশ্মীরী মুখের ওপর লালিমা খেলতে লাগল। অসংখ্য ভাবনার তুফানের মধ্যে সে নিগারকে উচ্চ কণ্ঠে বলল, "নিগার, তুমি কি গোলাম সন্তানের মা বলে নিজেকে স্বীকার করে নিতে পারবে?"

খানিকটা বিয়ের জন্যে খানিকটা বাবাজীর ভাষণ শুনে নিগার পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। গুলাম আলীর এই রূঢ় কথা শুনে আরও উন্মত্ত হয়ে উঠল। ও শুধু বলল, "জী···জী···আজ্ঞে···আজ্ঞে না।"

ভীড় আবার তালি বাজাল। আর গুলাম আলী আরও ভাবুক হয়ে

উঠল। নিগারের গোলাম সন্তানকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে গুলাম আলী খুশীতে মশগুল হয়ে গেল। সে আসল কথা থেকে দূরে সরে গিয়ে স্বাধীনতা হাসিল করার জন্যে এক আঁকা-বাঁকা গলির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে সে উদাস আর ভাবুকতার সঙ্গে বলে চলল। হঠাৎ তার চোখ নিগারের ওপর পড়ল। না জানি তার কি হয়ে গেল—তার সমস্ত কথা ফুরিয়ে গেল। মানুষ যেমন মদের নেশায় কোন হিসেব না করে টাকা বের করে এবং ব্যাগ খালি করে দেয় তেমনি তার ভাষণের ব্যাগ খালি দেখে সে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের দু জনকে আপনি আশীর্বাদ করুন। যে কথা আমরা দিয়েছি তা যেন রাখতে পারি।"

পরের দিন ভোর ছ'টায় শাহজাদা গুলাম আলী গ্রেফতার হয়ে গেল। কারণ স্বরাজ কায়েম না করা পর্যন্ত সন্তানের জন্ম বন্ধ করার যে অঙ্গীকার তার ভাষণে ছিল তাতে ইংরেজের গদি উলটে দেওয়ার ধমকও ছিল।

গ্রেফতারের কয়েক দিন পরে গুলাম আলীকে আট মাসের সাজা দেওয়া হল এবং তাকে জেলে পাঠানো হল। সে ছিল অমৃতসরের বিপ্লবী ডিকটেটর আর চল্লিশ হাজার বন্দীর মধ্যে একজন। কারণ যতদূর আমার মনে আছে এই আন্দোলনে যারা বন্দী হয়েছিল তাদের সংখ্যা সম্পর্কে সমস্ত কাগজই চল্লিশ হাজার বলেছিল।

সবারই ধারণা ছিল স্বাধীনতার মঞ্জিল আর মাত্র হাত দুই দূরে। ফিরিঙ্গী রাজনীতিজ্ঞরা এই আন্দোলনকে দুধের মতো ফুটতে দিয়েছিল। কিন্তু যখন ভারতবর্ষের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা হল তখন সেই ফুটন্ত দুধ ঠাণ্ডা হয়ে লস্যিতে পরিণত হয়ে গেল।

আজাদী-পাগলরা জেল থেকে বাইরে এসে জেলখানার কষ্ট এবং নিজেদের নষ্ট হয়ে যাওয়া ব্যবসা সামলাতে লেগে গেল। সাত মাস পরে শাহজাদা গুলাম আলী ছাড়া পেল। সেই সময় তার মধ্যে আর আগের উৎসাহ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও অমৃতসর স্টেশনে তাকে স্বাগত জানানো হল। আমি এগুলোতে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এই মহফিলগুলিতে কোন আনন্দ ছিল না। সবার ওপরে এক অদ্ভুত ধরনের ক্লান্তির ভাব ছেয়ে ছিল। যেন এক লম্বা দৌড়ের অংশগ্রহণকারীদের হঠাৎই বলা হল, দাঁড়াও, দৌড় আবার প্রথম থেকে শুরু হবে। আর যারা দৌড়াচ্ছিল তারা কিছুক্ষণ ধরে হাঁফানের পর

যেখান থেকে আবার দৌড় শুরু হবে সেদিকে উৎসাহহীন ভাবে এগিয়ে চলল।

বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছিল। কিন্তু রসকসহীন এই ক্লান্তি ভারতবর্ষ থেকে এখনও যায়নি। আমার নিজের জগতেও এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ছোট-খাটো বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। দাঁড়ি-গোঁফ উঠেছে। কলেজে ভর্তি হয়েছি। এফ. এ. তে দু' দুবার ফেল করেছি। বাবা মারা গিয়েছেন। রুজি-রোজগারের জন্যে বহু জায়গায় ঘুরেছি। এক থার্ড ক্লাস পত্রিকায় অনুবাদকের কাজ করেছি, এখানে মন না বসায় আবার পড়া-শোনার কথা ভেবেছি। আলিগড় ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হওয়ার তিন মাস পর টি. বি. তে আক্রান্ত হলাম। আক্রান্ত হয়ে কাশ্মীরের গ্রামগুলোতে ভবঘুরের মতো ঘুরতে লাগলাম। সেখান থেকে বোম্বাই এলাম। এখানে দু বৎসরে তিন তিনবার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দেখলাম। মন ভেঙে যাওয়ায় দিল্লী চলে এলাম। বোম্বাইয়ের তুলনায় এখানে সমস্ত কিছুতেই কেমন একটা শ্লথ শ্লথ ভাব। কোথাও কোন গণ্ডোগোল বা হাঙ্গামা হলে তাতে কোন পৌরুষ থাকত না—কেমন একটা মেয়েলিপনা। পরে মনে হল, এর থেকে বোম্বাই অনেক ভালো। সেখানে পাড়া-পড়শিদের নাম জিজ্ঞেস করার কোন ফুরসৎ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাতে কি আসে যায়! যেখানে অঢেল অবসর থাকে সেখানেই ছল কপট চালবাজী বেশী হয়। দু বৎসর দিল্লীর উৎসাহ উদ্দীপনা হীন জীবন কাটানোর পর প্রাণ-চঞ্চল বোম্বাইতে আবার ফিরে এলাম।

বাড়ি থেকে বেরোনোর পর আট বৎসর হতে চলল। বন্ধু-বান্ধব এবং অমৃতসরের রাস্তা এবং গলিগুলোর অবস্থা কি তা আমি জানি না। কারো কাছ থেকে চিঠি-পত্রও পেতাম না যে জানতে পারব। ফলে এই আট বৎসরে আমি আমার অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। কে তার অতীতের দিনগুলো নিয়ে ভাবে? আট বৎসর আগে যে দিনগুলো খরচ হয়ে গিয়েছিল তার হিসেব-নিকেশ করে এখন কি লাভ? জীবনের টাকায় সেই পাই-পয়সারই বেশী দাম আছে, যা তুমি আজকে খরচ করছ, আর আগামীকাল যার ওপর অন্যে নজর দেবে।

আজ থেকে ছ'বৎসর আগের কথা বলছি, যখন জীবনের টাকার ওপর আর রুপোর টাকার ওপর রাজার ছাপমারা ছিল তখন আমি এক পাই-পয়সাও খরচ করিনি। আমি এত গরীব ছিলাম না যে ফোর্টে গিয়ে কম দামের এক-জোড়া জুতাও কিনতে পারতাম না।

'আর্মি' এ্যান্ড নেভি স্টোর'-এর এই দিকে হার্ণবি রোডের ওপর এক জুতোর দোকান ছিল। তার শো কেশ আমাকে বহুক্ষণ ধরে আকৃষ্ট করে রেখেছিল। আমার স্মৃতি খুব কম জোড় বলে এই দোকান খুঁজে বের করতে বেশ সময় লেগে গিয়েছিল।

আমি তো নিজের জন্যে কম দামের এক জোড়া জুতা কিনতে এসে-ছিলাম। আর আমার যেমন অভ্যেস সেই অভ্যেস বসে অন্য দোকানের সাজানো জিনিস দেখেছিলাম। একটা দোকানে সিগারেট কেস দেখলাম, আর একটায় দেখলাম পাইপ। এইভাবে দেখতে দেখতে একটা ছোট্ট দোকানের সামনে হাজির হলাম। ভাবলাম এখানে ঢুকেই কিনে নিই। দোকানদার খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাকে স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি চান সাহেব?"

আমি একটু চিন্তা করে মনে করার চেষ্টা করলাম আমি কি চাই, "হাঁ,—ক্রেপ সোল সু!"

—"না, আমি রাখি না।'

বর্ষা এসে গিয়েছিল। ভাবলাম, গাম বুটই কিনে নিই—'গাম বুট বের করো।'

—"পাশের দোকানে পাওয়া যাবে। রবারের কোন জিনিস এখানে রাখা হয় না।"

আমি এমনি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

—"সেঠজীর মর্জি।"

এই স্পষ্ট এবং খুলাখুলি জবাব শুনে আমি দোকান থেকে যেই বেরুতে যাব তখনি একজন হাসি-খুশি মানুষের ওপর আমার নজর পড়ল। সে বাচ্চা কোলে নিয়ে ফুটপাতে ফলওয়ালার কাছ থেকে ফল কিনছিল। আমি বাইরে এলাম আর সে দোকানের দিকে মুখ ফেরাল। আমি চকমে উঠলাম, "আরে ……গুলাম আলী।"

'সাদাত', বলে ও বাচ্চা নিয়েই আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। বাচ্চার এটা পছন্দ হল না, তাই সে কেঁদে উঠল। গুলাম আলী সেই লোকটাকে ডাকল, যে আমাকে বলেছিল, রবারের কোন জিনিস এখানে রাখা হয় না। তাকে বাচ্চা দিয়ে বলল, 'যাও, একে ঘরে নিয়ে যাও।' তারপর সে আবার আমার দিকে ফিরে বলল, "কতদিন বাদে আমাদের দুজনের দেখা হচ্ছে।"

আমি গ্লোম আলীকে খ্ব ভালো করে লক্ষ্য করলাম—আগের সেই মেজাজ, সেই অল্প-অল্প গম্ভীরভাব, যা তার নিজস্ব আভিজাত্য ছিল তার কোন চিহ্ন আমি খ‍্ুঁজে পেলাম না। সেই অগ্নিবর্ষী বক্তা, সেই খদ্দরধারী নওজোয়ানের জায়গায় আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল এক সাধারণ গৃহস্থ। তার শেষ ভাষণের কথা আমার মনে পড়ে গেল। যে উদ্দীপ্ত ভাষণে জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তিম পরিবেশকে সে থরথর করে কাঁপিয়ে তুলেছিল, "নিগার, তুমি কি এক গোলাম সন্তানের মা বলে নিজেকে স্বীকার করে নিতে পারবে?" সঙ্গে সঙ্গে আমার গ্লোম আলীর কোলে যে বাচ্চা ছিল তার কথা মনে পড়ল।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "গ্লোম আলী, এই বাচ্চা কার?"

গ্লোম আলী যেন সংকোচ না করেই বলল, "আমার। এর বড় আর একটি আছে। তোমার কয়টি আছে?"

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল, গ্লোম আলী নয়, অন্য কেউ কথা বলছে। অসংখ্য চিন্তা আমার মনে খেলে গেল। গ্লোম আলী কি তার কসম ভুলে গিয়েছে? আর সেই বিপ্লবী জীবন থেকে কি সে এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন? হিন্দুস্তানকে আজাদী দেওয়ার সেই জোস সেই উচ্ছাস কোথায় গেল? সেই দাড়ি-গোঁফহীন আহ্বানের কি হল?…নিগার এখন কোথায়?…সেও কি দুটি গোলাম সন্তানের মা হওয়া স্বীকার করে নিয়েছে?……খ্ব সম্ভব ও বেঁচে নেই। হয়তো গ্লোম আলী আর একটা বিয়ে করেছে।

"কি ভাবছ?… দু-একটা কথা অন্তত বল। এতদিন পরে দেখা হল।" গ্লোম আলী আমার কাঁধে খ্ব জোরে একটি চাপড় মেরে বলল।

আমি কেমন বাকরুদ্ধ হয়েছিলাম। ওর কথায় চমকে উঠলাম। 'এ্যাঁ' বলে ভাবতে লাগলাম কিভাবে কথা শুরু করি। কিন্তু গ্লোম আলী আমার কথা বলার অপেক্ষা না করে বলতে লাগল, "এই দোকান আমার। দু বৎসর ধরে আমি এখানে—এই বোম্বাইতে আছি। কারবার খ্ব ভালোই চলছে। মাসে তিন-চার শ' হয়ে যায়। তুমি কি করছ? শুনেছি তুমি মস্ত গল্পকার হয়েছ। মনে আছে একবার আমরা পালিয়ে এখানে এসেছিলাম। দোস্ত, সেই বোম্বাই আর এই বোম্বাই-এর মধ্যে অনেক ফারাক বলে মনে হয়। যেন তা ছিল ছোট, আর এটা বড়।"

এমন সময় একজন খদ্দের এল। সে টেনিস স্যু চাইল। গ্লোম আলী

তাকে বলল, "রবারের জিনিস এখানে পাওয়া যায় না। পাশের দোকানে যান।"

খদ্দের চলে গেলে আমি গুলাম আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, "রবারের জিনিস তুমি কেন রাখ না? আমিও তো এখানে ক্রেপ সোল নিতে এসেছিলাম।"

আমি এমনিই এই প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু গুলাম আলীর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। খুব আস্তে সে বলল, "আমার পছন্দ নয় তাই।"

"কেন পছন্দ নয়?"

"এই রবার—এই রবারের তৈরী জিনিস," বলে সে হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু হাসতে না পেরে ও জোর করে শুষ্ক হেসে বলল, "আমি তোমাকে বলব। এ একেবারে ফালতু জিনিস, কিন্তু······কিন্তু আমার জীবনে এ কতখানি গভীরতা নিয়ে জড়িয়ে আছে, তোমাকে কি বলব।"

গভীর একটা চিন্তার রেখা গুলাম আলীর মুখে ফুটে উঠল। ওর চোখ, যে চোখে এখনও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের রেশ আছে তা ক্ষণিকের জন্যে নৈরাশ্যে ভরে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার তাতে আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠল, "দোস্ত এ জীবন হচ্ছে কথার ফুলঝুরি।······সত্যি বলছি সাদাত, আগের দিনগুলি, যে দিনগুলিতে আমার চিন্তার ওপর লিডারি চেপে বসেছিল তা ভুলে গিয়েছি। চার-পাঁচ বৎসর ধরে আমি ভালোই আছি। স্ত্রী আছে, বাল-বাচ্চা আছে, আল্লার রহম আছে।

গুলাম আলী বলতে লাগল, আল্লার রহমে কত পুঁজি নিয়ে কি ভাবে সে বিজনেশ শুরু করল, এক বৎসরে কত টাকা লাভ হল এবং এখন ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে। আমি তার কথার মাঝখানেই খোটা দিয়ে বললাম, "কিন্তু তুমি কোন্ ফালতু জিনিস নিয়ে শুরু করেছিলে, যা তোমার জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।"

গুলাম আলীর মুখ আর একবার ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে এক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এক সময় গভীর ভাবে যুক্ত ছিল,—কিন্তু এখন তা নেই ······বলতে গেলে তোমাকে এক দীর্ঘ গল্প বলতে হয়।

এর মধ্যেই তার চাকর এসে গেল। দোকানের ভার তাকে দিয়ে গুলাম আলী আমাকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে বসিয়ে সে আমাকে বলতে

লাগল রবারের জিনিস সম্পর্কে তার এত বিরূপ মনোভাব কেন।

"আমার বিপ্লবী জীবন কিভাবে শুরু হয় তা তো তুমি ভালো ভাবেই জান। আমার ক্যারেক্টর কেমন ছিল তাও তোমার জানা আছে। আমরা দুজনে প্রায় একই রকম ছিলাম। এ কথা আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের মা-বাবাও জোর দিয়ে বলতে পারতেন না যে আমার ছেলে ভালো। জানি না, আমি তোমাকে এসব কথা কেন বলছি। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি দৃঢ় চরিত্রের লোক ছিলাম না। আমার ইচ্ছা ছিল আমি কিছু করি। সেজন্যেই বিপ্লবের সঙ্গে আমার এত অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি মিথ্যাবাদী ছিলাম না। উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে আমি জীবনও দিতে পারতাম। এখনও তাই আছি। কিন্তু আমি বুঝেছি—অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এই সত্যে পেঁছেছি যে, হিন্দুস্তানের বিপ্লব এবং তার লিডাররা সব শিশু। আমি যেরকম ছিলাম ঠিক তেমনি আমার মতো তারাও শিশু। একটা ঢেউ উঠলে তাতে উৎসাহ-উদ্দীপনা শক্তি হৈ চৈ সবই থাকত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা আবার নিস্তেজ হয়ে পড়ত। আমার ধারণা ঢেউ সৃষ্টি করা হত কিন্তু তা আপনা থেকে হত না। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ঠিক ভাবে বোঝাতে পারলাম না।"

গুলাম আলীর চিন্তাধারার মধ্যে একটা প্রচণ্ড জ্বালা ছিল। আমি তাকে সিগারেট দিলাম। সিগারেট জ্বালিয়ে সে কসে কসে তিনবার টান দিয়ে বলল, "তোমার কি মনে হয় না আজাদী লাভের জন্যে হিন্দুস্তানের প্রতিটি প্রচেষ্টা নেহাতই দুর্ভাগ্য। প্রচেষ্টা না বলে বলা যায় প্রতিবারই তার পরিণতি হচ্ছে দুর্ভাগ্য। কেন আমরা আজাদী পাচ্ছি না? আমরা কি সবাই নপুংশুক? না। আমরা সবাই মরদ। কিন্তু আমরা এমন এক পরিবেশে আছি যে, আমাদের কাজের হাত আজাদী পর্যন্ত পেঁছুতে পারেনি।"

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কি মনে হয়, আজাদী আর আমাদের মধ্যে এমন কি আছে যা ব্যারিকেডে মতো দাঁড়িয়ে আছে।"

গুলাম আলীর চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল, "নিশ্চয়ই, কিন্তু তা কোন কংক্রিটের দেয়াল নয়, কোন কঠিন প্রান্তরও নয়—এ হচ্ছে আমাদের বিশ্বাসের এক পাতলা জাল। এ হচ্ছে আমাদের নকল জীবনের—যেখানে মানুষ অন্যকে প্রতারণা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও প্রতারিত করে।"

ওর মেজাজ তিরীক্ষি হয়ে উঠল। মনে হল ও ওর জীবনের অতীত ঘটনাগুলোকে নিজের মধ্যে ঝালিয়ে নিচ্ছে। সিগারেট নিভিয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে গলা ছেড়ে বলল, "মানুষ যেমন আছে তাকে তেমন ভাবেই থাকা উচিত। ভালো কাজ করার জন্যে নিজের মাথা নেড়া করা, গেরুয়া কাপড় পরা বা গায়ে ভষ্ম মাখার কি দরকার। তুমি হয়তো বলবে, এ তার ইচ্ছা। কিন্তু আমার মনে হয় তার এই ইচ্ছা—তার এই অদ্ভুত জিনিস থেকেই সে বিপথগামী হয়। উঁচুদরের মানুষ হয়েও তার ইচ্ছা মানুষের সাধারণ দুর্বলতা ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু সে ভুলে যায় তার ক্যারেক্টর তার চিন্তা-ভাবনা তার বিশ্বাস একদিন হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু তার নেড়া মাথা তার গায়ের ভষ্ম, তার গেরুয়া কাপড় সহজ সরল মানুষের মনে চিরদিন জাগরূক হয়ে থাকবে।"

বলতে বলতে গুলাম আলী আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল, "দুনিয়াতে এত সংস্কারক জন্মেছে যে মানুষ তাদের উপদেশ ভুলে গিয়েছে; রয়ে গিয়েছে শুধু তাদের····সুতো, দাড়ি, বালা আর বগলের চুল। এক হাজার বৎসর আগে যারা এখানে থাকত তার থেকে আমরা অনেক বেশী অভিজ্ঞ। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না আজকের সংস্কারকরা কেন এ কথা চিন্তা করছেন না যে তাঁরা শুধু মানুষের মুখের আদলটুকুই পালটাচ্ছেন। একেকবার মনে হয় চীৎকার করে বলি, খোদার নামে মানুষকে মানুষ হিসেবে থাকতে দাও। তার যে মুখের আদল পালটিয়েছ তা থাক, এখন তার ওপর একটু রহম কর। তুমি তাকে খোদা বানানোর চেষ্টা করছ, বেচারা তার মনুষত্ব হারাচ্ছে ······ সাদাত, আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, এ আমার অন্তরের কথা। আমি যা উপলব্ধি করেছি তাই বলছি। আমার এই উপলব্ধি যদি মিথ্যা হয় তবে কোন কিছুই সাচ্চা নয়। আমি দু'বৎসর মনের সঙ্গে জোড় কুস্তি লড়েছি। আমি আমার মন আমার উপলব্ধি আমার বিশ্বাস আমার প্রতিটি তন্ত্রীর সঙ্গে পাঞ্জা কষে বুঝতে পেরেছি মানুষকে মানুষই হতে হবে। হাজারের মধ্যে একজন দুজন মানুষ যৌন-ভাবনা থেকে মুক্ত। সবাই যদি যৌন-ভাবনা থেকে মুক্ত হয় তবে ভষ্ম কার কাজে লাগবে?"

এই পর্যন্ত বলে সে একটা সিগারেট নিল এবং সিগারেট জ্বালিয়ে ঘাড়কে একটু আলতো ভাবে ঝটকা দিয়ে বলল, "না সাদাত, তুমি জান না আমি দেহে আর মনে কী জ্বালাই না সহ্য করেছি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেই

যাক না কেন তাকে কষ্ট সহ্য করতেই হবে।···সেই দিন, সেই দিনের কথা তোমার নিশ্চয় মনে আছে···জালিয়ানওয়ালাবাগে আমি আর নিগার অঙ্গীকার করেছিলাম, গোলাম সন্তানের জন্ম দেব না। অঙ্গীকার করে এক অদ্ভুত ধরনের— বিদ্যুতের মতো এক আনন্দ অনুভব করেছিলাম। মনে হয়েছিল এই অঙ্গীকার করে আমার মাথা উঁচু হয়ে আকাশকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু জেল থেকে ফিরে এসে আমি এই কথার জন্যে দেহের যে জ্বালা তা ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলাম। আমার দেহের জ্বালায় অনুভব হতে লাগল, আমার দেহ আমার রক্ত সব কিছু ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। নিজের হাতে নিজের জীবনের বাগিচার সবচেয়ে সুন্দর ফুলকেই ছিঁড়ে কুটি কুটি করেছি।·····প্রথম প্রথম এই ভাবনা আমার মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের সান্ত্বনা সৃষ্টি করেছিল যে আমি অন্যের থেকে পৃথক, কারণ আমি এমন কাজ করেছি যা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার চেতনার তন্ত্রী জাগরিত হতে লাগল এবং বস্তুত আমার দেহের প্রতিটি লোম তীব্র জ্বালায় ভরে উঠল।······জেল থেকে ফিরে এসে আমি নিগারের সঙ্গে দেখা করলাম। হাসপাতাল থেকে তখনও বাবাজীর আশ্রমে চলে গিয়েছিল······সাত মাস জেল খাটার পর আমি যখন ওর সঙ্গে দেখা করলাম, দেখলাম ওর রঙ ওর মন ওর শরীর কেমন পালটে গিয়েছে। মনে হল আমি ভুল দেখছি।

"কিন্তু এক বৎসর—এক বৎসর ওর সঙ্গে কাটানোর পর।" বলতে বলতে গুলাম আলীর ঠোঁটের ওপর এক করুণ হাসি খেলে গেল—"হ্যাঁ এক বৎসর ওর সঙ্গে থাকার পর আমি বুঝতে পারলাম আমার মতো ওরও অবস্থা······ না ও আমার কাছে তা প্রকাশ করতে চাইল, না আমিও ওর কাছে প্রকাশ করতে চাইলাম।······আমরা দুজনেই নিজের নিজের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়ে রইলাম······এক বৎসরের মধ্যে বিপ্লবী জোস ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। খদ্দরের পোশাক এবং তেরঙ্গা ঝাণ্ডার প্রতি আগের সেই দরদ আর রইল না। কখনও কখনও যদিও ইনক্লাব জিন্দাবাদ শ্লোগান উঠত কিন্তু তাতে আগের সেই তেজ সে ঝাঁঝ ছিল না।···জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি তাম্বুও আর ছিল না······পুরনো ক্যাম্পের খুঁটি কোথাও কোথাও চোখে পড়ত······রক্তে টগবগ বিপ্লবী উত্তেজনা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল······ আমি তখন অধিকাংশ সময়েই ঘরে স্ত্রীর কাছে বসে থাকতাম।"

গেলাম আলীর ঠোঁটের ওপর আর একবার করুণ হাসি খেলে গেল। আমিও কোন কথা বললাম না, কারণ আমি তার ভাবনার জাল ছিঁড়তে চাইলাম না।

অনেকক্ষণ বাদে সে তার কপালের ঘাম পুছল এবং সিগারেট নিভিয়ে বলতে শুরু করল, "আমরা দুজনে এক অদ্ভুত ধরনের ধিক্কারে বন্দী ছিলাম। নিগারকে আমি কত গভীর ভাবে ভালোবাসতাম তা তো তুমি জান।······আমি ভাবতে লাগলাম, এই ভালোবাসা কি জিনিস? আমি ওকে স্পর্শ করলে ওর শরীর থরথর করে কেঁপে উঠত। আমি সেই কম্পনকে শেষ পর্যন্ত এগুতে দিতে চাইতাম না।······কোন পাপ হবে বলে কি আমি ভয় করতাম? নিগারের চোখ আমার খুব ভালো লাগত। একদিনের কথা বলছি, খুব সম্ভব সেদিন আমার অবস্থা ভালোই ছিল, প্রতিটি মানুষের যে ইচ্ছ হয় আমার মধ্যেও সেই ইচ্ছা জেগে উঠল, আমি নিগারকে চুমো খেলাম। ও আমার বাহুতে আবদ্ধ ছিল—আমার বাহুর মধ্যেই ও থরথর করে কেঁপে উঠল। আমার রক্ত যেন পাখির মতো ডানা মেলে আকাশের দিকে উড়ে যেতে চাইল, আর আমি ওকে জোরে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর—অনেক অনেকক্ষণ পর এবং কয়েক দিন পর্যন্ত আমি আমার এই কাজের জন্যে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমার এই বাহাদুরী কাজে আমার রক্তে এমন এক তৃপ্তি এসেছিল যা খুব কম মানুষেরই আসে। কিন্তু যা সত্য তা হচ্ছে আমি অপারক ছিলাম আর এই অপারকতাকেই আমি মহান কাজ বলে মনে করতে চাইছিলাম। খোদার কসম, আমার হৃদয়ের পবিত্রতা ছিল বলে আমি ভাবতাম আমার মতো দুখি মানুষ পৃথিবীতে আর দুটি নেই। কিন্তু মানুষও তো কোন না কোন ভাবে পথ খোঁজে—আমিও একটা পথ খুঁজে নিলাম। আমরা দুজনে এতেই সুখী ছিলাম—কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমাদের সমস্ত তৃপ্তি এবং কোমলতার ওপর পরত জমতে লাগল। আমাদের জীবনে এ ছিল এক বিরাট ট্র্যাজেডি। আমরা পরস্পরের কাছে পর হয়ে রইলাম। আমি ভাবতে লাগলাম—অনেক অনেক দিন ধরে ভাবার পর আমি আমার প্রতিজ্ঞাকে ঠিক মনে করলাম—নিগার গোলাম সন্তানের জন্ম দেবে না।"

এই কথাগুলি বলতে বলতে তার ঠোঁটের ওপর তৃতীয়বার সেই করুণ হাসি খেলে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে উচ্চ হাসির রোল তুলল, যে হাসিতে

মিশে ছিল দৈহিক জ্বালার এক অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা। নিজেকে সামলে নিয়ে গুলাম আলী বলতে লাগল, "আমাদের বিবাহিত জীবনের এক অদ্ভুত দৌড় শুরু হল। যেন অন্ধ একটি চোখ ফিরে পেয়েছে। আমি সামান্য আলোকেই এক পা তুললাম। কিন্তু এই আলোও অল্পক্ষণের মধ্যে ম্লান হতে লাগল। প্রথম প্রথম মনে হত…" গুলাম আলী ঠিক প্রতিশব্দের জন্যে হাতড়াতে লাগল……"প্রথম প্রথম আমরা ঠিক-ঠাকই ছিলাম। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি প্রথম প্রথম আমার একোবারেই মনে হয়নি যে অল্প দিনের মধ্যে আমি পাগল হয়ে উঠব…এক চোখ ভিক্ষা চাইতে লাগল আরেকটি চোখও যেন ঠিক হয়ে যায়। প্রথম প্রথম আমরা যেভাবে দৈহিক শুদ্ধতা বজায় রাখলাম তাতে আমাদের চেহারা খুলে গেল—নিগারের চোখে মুখে চমক খেল উঠল। আমার দেহ থেকেও সেই কাট-খোট্টা ভাব দূর হয়ে গেল; যে শুষ্কতা আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের দুজনের ওপর আবার এক অদ্ভুত মৃত-মৃত ভাব ছেয়ে যেতে লাগল। এক বৎসরের মধ্যে আমরা দুজনে রবারের পুতুলের মতো হয়ে গেলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা নিগারের চেয়ে বেশী তীব্র ছিল। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না সেই সময় আমি হাতের মাংসে যদি চিমটি কাটতাম মনে হত আমি রবার ধরে টানছি। মনে হত শরীরের ভেতর কোন রক্তের তন্ত্রী নেই। যতটুকু আমি জানি নিগারের অবস্থা আমার থেকে একটু পৃথক ছিল। ওর চিন্তা ভাবনা অন্য রকম ছিল। ও মা হতে চাইছিল। পাড়াতে কারো কোন ছেলে-পেলে হলে ও ওর দীর্ঘশ্বাস নিজের বুকের মধ্যেই চেপে রাখত। কিন্তু আমার বাচ্চা সম্পর্কে কোন আগ্রহ ছিল না। বাচ্চা না হয়েছে তো কি হয়েছে। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যাদের কোন বাচ্চাকাচ্চা নেই। একি কম কথা যে আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করছি? এতে আমি হয়তো খানিকটা আরাম বোধ করে ছিলাম সত্য, কিন্তু আমার মনের ওপর যখন রবারের ভির ভির জ্বালা শুরু হল তখন আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম।…আমি সব সময় রবারের কথাই ভাবতে লাগলাম। ফলে আমার মনের সঙ্গে রবার চিপটে গেল। রুটি খেতে গেলে রুটি আমার দাঁতের নীচে কচকচ করত।" বলতে বলতে গুলাম আলীর সারা শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেল, "জানি, খুবই বাজে এবং ভুল ব্যাপার ছিল, আঙুলে সব সময় মনে হত সাবানের মতো কিছু

একটা লেগে আছে···নিজের ওপরই বিতৃষ্ণা এসে গেল। মনে হচ্ছিল আমার শরীরের সমস্ত রসকস শুকিয়ে গিয়েছে আর রয়ে গিয়েছে শুধু খোলসটুকু। রবারের জিনিস ব্যবহার করলে যেমন হয় ঠিক সেই রকম।"

···গুলাম আলী হাসতে লাগল,···"ভাগ্যিস,···"এই ঘিন ঘিনে ভাবটা দূর হয়ে গিয়েছিল, সাদাত, কিন্তু তা গিয়েছিল অনেক কষ্টের পরে।··· জীবন শুকিয়ে একেবারে কুচকে গিয়েছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় মরে গিয়েছিল,··· কিন্তু এই স্পর্শকাতর ইন্দ্রিয় অস্বাভাবিক ভাবে তেজি হয়ে উঠেছিল··· তেজি বললে ভুল হবে···স্রেফ তা একটা রবার হয়ে গিয়েছিল···কাঠ আয়না লোহা কাগজ পাথর—সমস্ত জায়গায় রবারের সেই প্রাণহীনতা দেখতাম। আর তা এত নরম ছিল যে বমি এসে যেত। এই কষ্ট ছিল আরও গভীর আরও মর্মান্তিক। আমি এর কারণ যখন ভাবতাম···দু আঙুল দিয়ে তা উঠিয়ে হয়তো ছুঁড়ে ফেলতে পারতাম, কিন্তু আমার মধ্যে সেই হিম্মত ছিল না। চাইতাম, কেউ আমকে এ ব্যাপারে সাহায্য করুক। কষ্টের এই অতল সমুদ্রে যদি এক টুকরো খড়ও যদি পাই তবে কিনারায় পেঁছুতে পারি···অনেক দিন পর্যন্ত আমি হাত-পা ছুঁড়তে লাগলাম।···একদিন আমি ছাদের রোদে বসে যখন একটা ধর্মের বই পড়ছিলাম, পড়ছিলাম বললে ভুল হবে এমনি চোখ বুলোচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার চোখ হাদিসের এক ছত্রে পড়ল। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। আমার চোখের সামনেই তো অবলম্বন ছিল। আমি বারবার সেই পংতিগুলো পড়লাম, আমার শুষ্ক জীবনে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে গেল···লেখা ছিল, বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর সন্তান জন্ম দেওয়া কর্তব্য···মা-বাবার জীবন যদি বিপদসংকুল হয় একমাত্র তখনই বংশ বৃদ্ধি রোধ করা উচিত, তা ছাড়া নয়। আমি দু আঙুলে সেই কষ্টকে তুলে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

এ কথা বলে সে শিশুর মতো হাসতে লাগল। আমিও হেসে দিলাম। কারণ দু আঙুল দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা সে এমনভাবে ছুঁড়ে দিল যেন তা কোন ঘৃণার জিনিস।

হাসতে হাসতে গুলাম আলী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, "সাদাত আমি জানি, আমি এতক্ষণ তোমাকে যা বললাম, তুমি তা নিয়ে গল্প ফেঁদে বসবে। কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা কর না।

খোদার কসম খেয়ে বলছি, যা অনুভব করেছি তাই তোমাকে বলেছি। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করব না। যা কিছু আমি পেয়েছি তা দুর্ভাগ্যের বিরোধিতা করেই পেয়েছি—কিন্তু সে বিরোধিতায় কোন বাহাদুরি নেই। এর কি অর্থ আছে যে তুমি ভুখা থাকতে থাকতে মরে যাও বা বেঁচে থাক···কবর খুঁড়ে সেখানে নিজেকে গোড় দাও আর কয়েকদিন ধরে তার মধ্যে দম বন্ধ করে থাক, তীক্ষ্ণ শর শয্যায় মাসের পর মাস শুয়ে থাক, বছরের পর বছর এক হাত ওপরে উঠিয়ে রাখ বা শুকিয়ে শুকিয়ে একেবারে কাঠি হয়ে যাও—এই রকম মাদারি খেলা খেলে না খোদাকে পাওয়া যায়, না স্বরাজ পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস হিন্দুস্তান যে স্বরাজ পাচ্ছে না তার কারণ এখানে মাদারি খেলওয়ারের সংখ্যাই বেশী—লিডার কম। যা চলছে তা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়··· সত্য আর সাচ্চা হৃদয়ের বার্থ কণ্ট্রোল করার জন্যে তারা বিপ্লবকে গ্রহণ করেছে। এ এমন এক বিপ্লব, যে বিপ্লব স্বাধীনতার গর্ভ-নাড়ির মুখকেই বন্ধ করে দিয়েছে···”

গুলাম আলী আরও কিছু বলতে চাইছিল, এমন সময় তার চাকর ভেতরে এল। তার কোলে গুলাম আলীর আর একটি বাচ্চা ছিল। বাচ্চাটির হাতে একটি সুন্দর রঙীন বেলুন ছিল। গুলাম আলী পাগলের মতো সেই বেলুনটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।—ফটাশ করে বেলুনটি ফেটে গেল। বাচ্চার হাতে সুতোর সঙ্গে ছোট্ট একটা রবার ঝুলতে লাগল। গুলাম আলী দু আঙ্গুল দিয়ে সেই রবারের টুকরোটা নিয়ে এমন ভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিল যেন তা একটা ঘৃণার জিনিস।

উনিশ শ' উনিশের একটি ঘটনা

ভাইজান, এ হচ্ছে উনিশ শ' উনিশ সালের ঘটনা। যখন রাওলাট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে সারা পাঞ্জাবে এজিটেশন চলছে। আমি অমৃতসরের কথা বলছি। স্যার মাইকেল ওডবাইন ডিভেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলের বলে গান্ধীজীর পাঞ্জাবে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। পাঞ্জাবের আসার পথে পলবলে গান্ধীজীকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে বোম্বাই-এ ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়। ভাইজান, আমার যতটুকু রাজনৈতিক জ্ঞান আছে, তাতে মনে হয়, ইংরেজরা যদি এ ভুল না করত তবে জালিয়ানওয়ালাবাগের এই মসি লিপ্ত ইতিহাসের মর্মান্তিক ঘটনা হয়তো ঘটনা না।

কি মুসলমান কি হিন্দু কি শিখ সবাই অন্তর দিয়ে গান্ধীজীকে সম্মান করত। সবাই তাঁকে মহাত্মা মনে করত। লাহোরে যখন তাঁর গ্রেফতারের খবর পেঁছিুল, তখন সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেল। লাহোর থেকে খবর যখন অমৃতসরে পেঁছিুল, তখন মুহূর্তের মধ্যে সেখানে হরতাল হয়ে গেল।

শোনা যায় নয়ই এপ্রিল, সন্ধ্যায় ডক্টর সত্যপাল এবং ডক্টর কিচলুর জ্বালাময়ী ভাষণ এবং বক্তব্য ডেপুটি কমিশনার পর্যন্ত পেঁছিয়। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার তা স্বীকার করে নিতে রাজী হয় না। কারণ সে জানত, অমৃতসরে দাঙ্গাহাঙ্গামা হওয়ার কোনরকম সম্ভবনা নেই। অমৃতসরে মানুষ অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে প্রোটেস্ট, জনসভা ইত্যাদি ইত্যাদি করছে। এইসব প্রোটেস্ট এবং জনসভা যেভাবে হচ্ছে, তাতে হিংসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি নিজের চোখে যা যা প্রত্যক্ষ করেছি, তা বলছি। সেদিন ছিল রামনবমীর দিন। মিছিল বেরিয়েছিল, কিন্তু কার এমন হিম্মত ছিল যে হুকমতের বিরুদ্ধে এক পা ওঠায়। কিন্তু ভাইজান, স্যার মাইকেল ছিল এক আধ-পাগলা মানুষ। সে ডেপুটি কমিশনারের কোন কথাই শুনল না। কারণ তার মগজে একটি কথাই গুঞ্জরিত হচ্ছিল, লিডর মহাত্মা গান্ধীর সামান্যতম ইশারায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কেঁপে উঠবে। আর যে হরতাল চলছে, জনসভার যে আয়োজন হচ্ছে—এ সব কিছুর অন্তরালে রয়েছে একটিই উদ্দেশ্য—তা হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করা।

ডক্টর কিচলু এবং ডক্টর সত্যপালের জ্বালাময়ী ভাষণের খবর মুহূর্তের মধ্যে সারা শহরে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকের মধ্যেই কেমন একটা উদাসী উদাসী ভাব। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি কোন ঘটনা ঘটল। কিন্তু ভাইজান, কি বলব, সারা শহরে কি উত্তেজনা আর উৎসাহ। দোকান-পাট সব বন্ধ। দেখে মনে হচ্ছিল শহর নয়, যেন কবরখানা। কিন্তু সেই কবরখানার নিস্তব্ধতার মধ্যেও যেন একটা শব্দ—একটা ধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছিল। যখন ডক্টর কিচলু এবং ডক্টর সত্যপালের গ্রেফতারের খবর এল, তখন হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে ডেপুটি কমিশনারের কাছে আর্জি পেশ করল,—তাদের প্রিয় নেতাদের যেন মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু ভাইজান, সে জামানায় আর্জি শোনার মতো কোন পরিবেশ ছিল না। স্যার মাইকেল ছিল ফ্রাউনওয়ালা হাকিম। আর্জি শোনার বদলে সে জনতার এই ভিড়কে বেআইনী ঘোষিত করল।

অমৃতসর ছিল একদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে বড় প্রাণকেন্দ্র। অমৃতসরের বুকের ওপর ছিল গর্ব করার মনো জালিয়ানওয়ালাবাগের এক গভীর ক্ষত চিহ্ন। সেই অমৃতসর আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছাড়ুন, এসব কাহিনী। ভাবলে সমস্ত অন্তরাত্মা দুঃখে উজ্জল হয়ে উঠে। লোকে বলে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এই পবিত্র শহরে যা ঘটেছে তার জন্যে দায়ী ইংরেজরা। হয়তো তাই-ই হবে ভাইজান, কিন্তু সত্যিসত্যি যদি জিজ্ঞেস করেন, তবে আমি বলব, এই রক্তে আমাদের নিজেদের হাতই রঞ্জিত হয়েছে। আর...

ডেপুটি কমিশনারের বাংলো ছিল সিভিল লাইন্সে। হোমরা-চোমরা অফিসার আর বড় বড় টোডিরা শহরের এই এলাকায় থাকত। আপনি যদি অমৃতসর দেখে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই জানেন শহর আর সিভিল লাইন্সের মধ্যে যোগসূত্রের জন্যে রয়েছে একটি পুল। এই পুল পার হলেই শান্ত এবং ছায়ানিবিড় পথ। আর হাকিমরা যেন তা স্বর্গ বানিয়ে রেখেছে।

মিছিল যখন পুলের কাছে এসে পেঁছিল, সবাই দেখল পুলের ওপর ঘোড়সওয়ার গোরা সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। মিছিল কিন্তু থাকল না,—এগিয়ে চলল। ভাইজান, সেই মিছিলে আমিও সামিল ছিলাম। উৎসাহ আর উদ্দীপনা কতখানি ছিল তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে সবাই ছিল নিরস্ত্র। কারও হাতে একটা লাঠিও ছিল না। সবাই তো মিছিলে

এ-জন্যে সামিল হয়েছিল, তারা তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হাকিমের কাছে পেঁছে দেবে। আর্জি পেশ করবে, ডক্টর কিচলু এবং ডক্টর সত্যপালকে যেন বিনাশর্তে মুক্তি দেয়া হয়।

মিছিল পুলের দিকে এগিয়ে চলল। পুলের কাছে পেঁছুতে-না-পেঁছুতে গোরাই সৈন্যরা ফায়ারিং করতে আরম্ভ করে। ফায়ারিং শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডগোল এবং হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। খুব বেশী হলে গোরা সৈন্যদের সংখ্যা ছিল বিশ থেকে পঁচিশ। আর মিছিলে ছিল হাজার হাজার লোক। কিন্তু ভাইজান, গুলি চলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। খোদার নামে কসম খেয়ে বলছি, গুলিতে কেউ কেউ আহত হল, আর কেউ কেউ বা ছুটে পালানোর সময় জখম হল।

ডান দিকে ছিল পচা নর্দমা। কারো সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমি সেই পচা নর্দমার মধ্যে পড়লাম। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। আহতরা রাস্তায় পড়েছিল। আর তাই দেখে গোরারা দাঁত বের করে হাসছিল। ভাইজান, আমি ঠিক বলতে পারব না, সেই সময় আমার অবস্থা কি রকম হয়েছিল। পচা দুর্গন্ধময় নর্দমায় পড়ে যাওয়ার সময় আমার কোনরকম হুস ছিল না। নর্দমা থেকে উঠে যা যা ঘটেছিল তা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল এবং সমস্ত অবস্থাটা আমার মগজের মধ্যে ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে লাগল।

দূরে চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিস। যেন অসংখ্য মানুষ একসঙ্গে রাগে ঘৃণায় চিৎকার করছিল। পচা নর্দমা পার হয়ে পীর কে তকিয়েকে পিছনে ফেলে হাল দরওয়াজের কাছে যখন পেঁছুলাম, দেখলাম ত্রিশ-চল্লিশ জন যুবক এক প্রচণ্ড উৎসাহ এবং উত্তেজনায় বড় বড় পাথর হাল দরওয়াজের যে বড় ঘড়ি, সেদিকে ছুঁড়ে মারছে।

ঘড়ির কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে যখন ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল, তখন একটি ছেলে বলল, "চল, রাণীর মূর্তি ভাঙি।"

অন্য একজন বলল, "না, বন্ধুগণ···চল থানায় আগুন লাগাই"

আর একজক বলল, "বরং ব্যাংকগুলি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিই।"

আর একজন বলল, "এসব করে কি হবে? তার চেয়ে বরং চল, পুলের ওপর টহলদার গোরাদের ঠেঙাই।"

আমি ছেলেটিকে চিনতে পারলাম। ও ছিল থেলা কঞ্জর। ভালো নাম মহম্মদ তুফায়েল। কিন্তু ও থেলা কঞ্জর নামেই সবার কাছে পরিচিত ছিল।

ওকে সবাই কঞ্জর বলত, কারণ ও ছিল এক বেশ্যার ছেলে। ও ছিল ভবঘুরে। ছেলে বেলাতেই জুয়া আর নেশাভাঙের প্রতি ওর প্রচণ্ড আসক্তি জন্মে। ওর দু'জন বোন ছিল। নাম শমশাদ এবং অলমাস। তাদের কালে তারা দুজনেই ছিল নামকরা সুন্দরী বেশ্যা। শমশাদের কণ্ঠস্বর ছিল খুব মিষ্টি সুরেলা। ওর মুজরা শোনার জন্যে দূর দূরান্ত থেকে পয়সাওয়ালা লোকরা আসত। ভাইয়ের কাণ্ডকারখানায় জন্যে ওরা দু' বোনই চিন্তিত থাকত। শহরের সবাই জানত, ওরা ওদের ভায়ের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন করেই দিয়েছে। কিন্তু ওর যখন হাত টানাটানি চলত, তখন ও দু' বোনের কাছ থেকেই কিছু না কিছু নিত। এমনি থেলা খুব হাসিখুশি ছিল। ভালো খেত, ভালো পরত। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসত। হাসির আর মজাদার গল্প বলতে ও ছিল ওস্তাদ। কিন্তু হিজরেদের মতো কোন রকম ভাঁড়ামি ও করত না। লম্বা, পুরুষ্ট হাত, শক্ত-সমর্থ দেহ, চোখ-মুখও তেমনি সুন্দর।

উৎসাহী ছেলেরা ওর কথায় কোন কান দিল না। তারা রাণীর মূর্তির দিকে এগিয়ে চলল। ও আবার ওদের বলল, "বেশী জোস দেখিও না, আমার কথা শোন। আমার সঙ্গে চল। যে গোরারা আমাদের বেকসুর ভাই-বেরাদারদের হত্যা এবং জখম করেছে, তাদের আক্রমণ করি। খোদার কসম খেয়ে বলতে পারি, আমরা সবাই এক জোট হলে পায়রার মতো ওদের গলা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারি...'

কেউ কেউ মূর্তি ভাঙতে চলে গেল। কেউ কেউ বা থমকে দাঁড়াল। থেলা পুলের দিকে এগিয়ে গেল। অন্যরাও ওর পেছনে পেছনে চলল। আমি বুঝতে পারলাম, ওরা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফোয়ারার পেছনে নিজেকে আড়াল করে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি সেখানে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে থেলাকে বললাম, "থেলা ওদিকে যেও না... কেন মিছেমিছি নিজের আর অন্যদের মৃত্যু ডেকে আনছ...।"

আমার হাঁক শুনে থেলা এক অদ্ভুত কণ্ঠে আমাকে চিৎকার করে বলল, "থেলা শুধু জানাতে চায়, থেলা গুলিকে ভয় করে না।" তারপর সে তার সঙ্গীসাথীদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, "তোমরা যদি ভয় পাও, তবে ফিরে যেতে পার।"

এরকম এক অবস্থায় যে পা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, সে পা কিভাবে

ঘুরে দাঁড়ায়। আর এমন এক সময় তা কি করে সম্ভব যখন লিডার নিজের প্রাণ হাতে করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? খেলা দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললে ওদের পদক্ষেপও দ্রুত হল।

হাল দরওয়াজে থেকে পুলের দূরত্ব খুব একটা বেশী নয়। বেশী হলে ষাট-সত্তর গজের মতো। খেলা ছিল সবার সামনে। যেখান থেকে পুলের শুরু, তার ঠিক পনেরো-বিশ পা পেছনেই দু'জন গোরা-ঘোরসওরার দাঁড়িয়েছিল। শ্লোগান দিতে দিতে খেলা যখন পুলের রেলিং-এর কাছে পেঁছুল, ঠিক তখনই ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল। ভাবলাম, খেলার গুলি লেগেছে। কিন্তু দেখলাম, না, সে তেমনি ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। সে মরেনি। ওর অন্যান্য সাথীরা ভয়ে পালাল। ও পেছন ফিরে তাকাল। চিৎকার করে বলল, "পালাচ্ছ কেন…চলে এসে।"

ও আমার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় অবার গুলি চলল। ও ঘুরে গোরাদের দিকে তাকাল। তারপর পিঠের ওপর হাত রাখল। ভাইজান কী বলব, আমি যেন চোখে কিছুই দেখছিলাম না। দেখলাম, ওর সাদা ধবধবে জামা ছোপ ছোপ লাল রক্তে ভিজে উঠেছে। ও আরও লম্বা বড় বড় পা ফেলে আহত বাঘের মতো গোরদের দিকে এগিয়ে গেল। আবার গুলি চলল। ও টলতে লাগল। কিন্তু ওর প্রতিটে পদক্ষেপ তেমনি দৃঢ়। ও এক গোরা-ঘোড়সওয়ারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পলক পড়তে না পড়তেই তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। গোরা মাটিতে ছিটকে পড়ল। আর ওর বুকের ওপর খেলা। কাছেই ছিল আর একজন ঘোড়সওয়ার। সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। এক হাতে ঘোড়ার রাশ টেনে সে গুলি চালাতে লাগল। তারপর কি হয়েছিল, আমি জানি না। আমি ফোয়ারার কাছে বেহুশ পড়েছিলাম।

ভাইজান, যখন আমার জ্ঞান ফিরল, দেখলাম আমি নিজের ঘরে শুয়ে আছি। আমার পরিচিতরা আমাকে ফোয়ারার পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে বাড়িতে নিয়ে আসে। ওদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, গুলি চলার পর জনতা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠে। উত্তেজিত জনতা রাণীর মূর্তি ভাঙার চেষ্টা করে। টাউন হল এবং তিনটি ব্যাঙ্কে জনতা আগুন লাগায়। পাঁচ-ছ'জন ইউরোপিয়ান এই হাঙ্গামায় নিহত হয়। শহরে লুটপাট চলে।

লুটপাটের ঘটনাকে ইংরেজ অফিসাররা তেমন কোনও গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু যে পাঁচ-ছ'জন ইউরোপিয়ান নিহত হয়েছিল, তার বদলা হিসেবে তারা জলিওয়ালাবাগের নিরস্ত্র মানুষের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাল। ডেপুটি কমিশনার শহরের শাসনভার জেনারেল ডায়ারের হাতে তুলে দিল। জেনারেল ডায়ার বারোই এপ্রিল সেনাবাহিনীর সঙ্গে শহরের বিভিন্ন অঞ্চল টহল দিল। অসংখ্য নির্দোষ এবং নিরীহ মানুষকে গ্রেফতার করল। তেরোই এপ্রিল জালিওয়ানালাবাগে জনসভা হয়। প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে জেনারেল ডায়ার সশস্ত্র গোর্খা এবং শিখ সৈন্য নিয়ে সেখানে হাজির হল। নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি চালাতে শুরু করল।

ঠিক কত মানুষ নিহত হয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে তা বোঝা যায়নি। কিন্তু পরে যখন অনুসন্ধান হয়, তখন জানা যায় এই গুলি চালনায় এক হাজার মানুষ মারা যায়, আর তিন থেকে চার হাজারের মতো মানুষ জখম হয়....। হাঁ, আমি তো খেলার কথা বলছিলাম। ভাইজান নিজের চোখে যা দেখেছি, তাতো আপনার কাছে বলেছি। আমি একজন নির্ভেজাল সাদাসিধে মানুষ। কিন্তু মৃতের মধ্যে চারটি দোষ অবশ্যই মজুত ছিল। একজন বেশ্যার গর্ভে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও ওর মধ্যে ছিল প্রচণ্ড প্রাণ প্রাচুর্য। আমি এখন গভীর বিশবাসের সঙ্গে বলতে পারি, ঐ বদমাশ গোরাদের প্রথম গুলি ওর বুককেই বিদ্ধ করেছিল। গুলির শব্দ শুনে ও যখন ঘাড় ফিরিয়ে ওর বন্ধুদের সাবধান করে দিচ্ছিল, তখন ও উত্তেজনার নেশায় এমন বেহুশ ছিল যে, বুঝতেই পারেনি তপ্ত লোহার বুলেট ওর বুককে বিদ্ধ করেছে। দ্বিতীয় গুলি ওর পিঠকে বিদ্ধ করে। তৃতীয় গুলি আবার ওর বুকে এসে লাগে।...আমি দেখিনি, কিন্তু শুনেছি, খেলা এমন ভাবে তার দু'হাতের পাঞ্জা দিয়ে গোরা সৈন্যের গলা টিপে ধরেছিল যে, সেই পাঞ্জা খুলে গোরাকে মুক্ত করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যখন মুক্ত করা হল তখন দেখা গেল সেও মৃত।

পরের দিন দফন-কফনের জন্যে খেলার লাশ যখন তার আত্মীয়স্বজনদের দেয়া হল, দেখা গেল ওর সারা শরীর গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। সাথীর অবস্থা দেখে অন্য গোরা সৈন্য তার পিস্তলের সমস্ত গুলিই খেলার ওপর খরচ করে। আমার ধারণা সেই সময় খেলার রক্ত আর তার দেহের

মধ্যে ছিল না। কিন্তু তবুও ঐ শয়তান থেলার মত দেহের ওপর চাঁদমারি খেলে।

শোনা যায়, থেলার লাশ যখন মহল্লায় নিয়ে আসা হয়, তখন সারা মহল্লায় হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়। ওর প্রতিবেশীদের মধ্যে ও এমন কোন কেউকেটা ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া ওর লাশ দেখে সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ে। ওর দুই বোন শমশাদ আর অলমাস ওকে দেখে জ্ঞান হারায়। যখন জানাজা ওঠে, তখন ওরা এমন বিলাপ করতে শুরু করে যে, সেখানে যারা ছিল তাদের চোখ দিয়েও যেন অশ্রুর বদলে টপটপ করে রক্ত পড়তে লাগল।

ভাইজান, আমার ঠিক মনে নেই, কোথায় যেন পড়েছিলাম, ফ্রান্সে যখন ইনক্লাব শুরু হয়, সেই সময় প্রথম গুলি যার বুকে লাগে সে ছিল এক-জন নগণ্য মানুষ। মরহুম মহম্মদ তুফায়েল দিল একজন বেশ্যার সন্তান। ইনক্লাবের এই ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে যে প্রথম গুলি ওকে বিদ্ধ করে, তা কতোতম গুলি ছিল সে খবর কেউ রাখেনি। রাখেনি তার কারণ হয়তো সোসাই-টিতে এই গরীবের কোন স্থান নেই। আমার বিশ্বাস, পাঞ্জাবের এই রক্তে যারা অবগাহন করেছে, সেই অবগাহনের তালিকাতে থেলা কঞ্জরের কোন নাম-নিশানাই থাকবে না।···অবশ্য আমি জানি না, এ ধরনের কোন তালিকা তৈরি হয়েছিল কিনা।

সে-সময় ছিল প্রচণ্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামার মরশুম। একটার পর একটা সামরিক আইন লাগাতার জারি হচ্ছে। যাকে মার্শাল ল বলে। আর মার্শাল ল শহরের অলিতে গলিতে আওয়াজ তুলে জানান দিয়ে যাচ্ছিল। আর তাই এই গরীব বেচারাকে খুব তাড়াতাড়ি দফন করা হল। ওর এই মৃত্যুতে ওর জন্যে শোক করাও ছিল ওর আত্মীয়স্বজনদের কাছে বেআইনী। তাই এই শোকের চিহ্ন ওরা এক লহমায় মুছে ফেলতে চাইল।

ভাইজান, থেলার মৃত্যু হয়েছিল। থেলাকে দফনও করা হয়েছিল। আর···আর···বলতে বলতে আমার সফরের সাথী এই প্রথম ক্ষণিকের জন্যে থামল এবং কেমন নীরব হয়ে গেল।

গাড়ি ঝকমক খটখটাং আওয়াজ তুলে দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছিল। আর রেল লাইনে যে খটখটাং আওয়াজ হচ্ছিল, সেই দোদুল আওয়াজের

সঙ্গে নিজের কণ্ঠকে মিলিয়ে দিয়ে সে আবার বলতে লাগল, "থেলা মারা গিয়েছে···থেলাকে দফন করা হয়েছে···থেলা মারা গিয়েছে···থেলাকে দফন করা হয়েছে···থেলার মৃত্যু এবং দফনের মধ্যে তেমন কোন দূরত্ব ছিল না। যেন থেলা এখানে মারা গিয়েছে, আর এখানে থেলাকে দফন করা হয়েছে। এই খটখটাং আওয়াজের মধ্যে ওর কথাগুলি এমনভাবে মিলেমিশে একাকার গিয়েছিল যে, আমার মস্তিষ্কের কোষ থেকে তা বিচ্ছিন্ন করার জন্যে আমি সচেষ্ট হয়ে উঠলাম। তাই আমার সফরের সাথীকে বললাম, "আপনি যেন আরও কিছু বলতে চাইছিলেন।"

চমকে সে আমার দিকে চাইল, "হাঁ, এই কাহিনীর দুঃখের শেষ অংশটুকু এখনও বাকী আছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি বাকী আছে ?"

ও বলতে শুরু করল, "আমি আপনাকে বলেছি থেলার দুই বোন ছিল। শমশাদ আর অলমাস। দু'জনেই ছিল অপূর্ব সুন্দরী। শমশাদ ছিল লম্বা, একহারা। চোখ দুটি ছিল ঢলঢল। খুব সুন্দর ঠুমরি গাইত। দ্বিতীয় জন অলমাস। ওর কণ্ঠ তেমন সুরেলা ছিল না। কিন্তু ওর কণ্ঠে এক অসামান্য ভঙ্গিমা ছিল। যখন মুজরা করত, তখন মনে হত ওর সারা অঙ্গ যেন কথা বলছে। ওর প্রতিটি ভাবের মধ্যে একটা নিজস্ব অভিব্যক্তি ছিল।···ওর চোখে ছিল যাদু। আর সে যাদু প্রত্যেকের মস্তিষ্কের মধ্যে গেঁথে বসত।

আমার সফরের সাথী ওদের প্রশংসার এমন মশগুল ছিল যে, ওদের প্রশংসার জন্যে যতটুকু সময় দরকার তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী সময় নিল। আমি ওকে থামানো ঠিক মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পর সে নিজেই সে প্রশংসার ঘোরপাক থেকে অনায়াসে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে সে তার গল্পের দুঃখের যে অংশ, সেই অংশের দিকে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। "ভাইজান, তারপর, হয়তো কোন জো হুজুর ফৌজি অফিসারদের কানে থেলার দুই বোনের সৌন্দর্যের কথা তোলে। ক্লাবের এক মেম, কি নাম যেন ছিল সেই ডাইনির····ও হাঁ, মিস···মিস শরোদ। মারা গিয়েছে····ঠিক করা হল ওদের ক্লাবে ডাকা হবে···আর···জি ভরে গ্রহণ করা হবে ওদের স্বাদ—ভাইজান, আপনি নিশ্চয়ই ব্যাপারটা অনুভব করতে পারছেন।

বললাম "আজ্ঞে হাঁ, তা পারছি।"

আমার সঙ্গী বুক ভরে নিশ্বাস নিল। বলল, "এ এক ভীষণ দুঃখের ঘটনা। বেশ্যাদেরও তো মা-বোন আছে। কিন্তু ভাইজান, আমার ধারনা, এই দেশ ইজ্জত বলতে কি তা বোঝে না। যখন ওপরওয়ালার হুকুম এল, সঙ্গে সঙ্গে থানার লোক তৈরি হল। থানার লোক যেহেতু শমশাদ আর অলমাসের বাড়ি জানে, সেজন্যে তারা নিজেরাই তাদের কাছে গেল। বলল, সাহেবরা তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছে। তারা তোমাদের মুজরা শুনতে চায়।.... ভাই-এর কবরের মাটি তখনও শুকোয়নি। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সবে দু দিনই অতিবাহিত হয়েছে। এরই মধ্যে সাদর অভ্যর্থনা এল,--নাচো গাও।...এর চেয়ে যন্ত্রণার আর কি ব্যথা হতে পারে।...আমার বিশ্বাস এমন ঘটনা আর কোথাও কোনদিন ঘটেনি...যারা হুকুম দিয়েছিল, তারা কি জানে বেশ্যারও দুঃখ-কষ্ট আছে।...আছে নিশ্চয়ই...কেন থাকবে না? সে নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন করল, আদতে সে আমাকেই প্রশ্ন করল।

আমি বললাম, "হয়তো আছে!"

"...থেলা তো তাদেরই ভাই। কোন জুয়োর আড্ডায় মারপিট করে সে মরেনি, মদ খেয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা করেও সে জান দেয়নি। সে তার দেশের জন্যে বীরের মতো লড়াই করতে করতে মৃত্যুর মদিরা পান করেছে। এক বেশ্যার গর্ভে তার জন্ম। ওর মা ছিল বেশ্যা। আর সে বেশ্যার দুই মেয়ে—শমশাদ আর অলমাস।...তারা দু'জনেই ছিল থেলার আপন বোন।...প্রথমে বোন, তার পরে হচ্ছে তারা বেশ্যা।...তারা থেলার লাশ দেখে জ্ঞান হারিয়েছিল। যখন ওর জানাজা উঠল তখন ওরা এমন ডুকরে কেঁদে ছিল সে, দেখে প্রতিটি মানুষের চোখ দিয়ে যেন টপটপ করে রক্ত-অশ্রু ঝরে পড়েছিল।..."

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওরা গিয়েছিল?"

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে আমার সফরের সঙ্গী ক্ষানিকক্ষণ চুপ করে থেকে উদাস ভাবে বলল, "হাঁ গিয়েছিল...খুব সেজেগুজেই গিয়েছিল।" ওর কথার মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গের একটা রেশ ছিল। "ষোল-শৃঙ্গার করে তারা সেখানে হাজির হয়েছিল।...শুনেছি মহফিল খুব জমেছিল।...দু' বোনই তাদের অসাধারণ কলানৈপুন্য দেখায়।...ওদের দু'জনকে যেন স্বর্গের অপ্সরার মতো মনে হচ্ছিল।...মহফিল মদের দরিয়ায় ভাসছিল, ওরা নাচছিল

গাইছিল।...দু-ই সমানে চলছিল। মদ নাচ আর গান। শোনা যায় রাত দু'টোর সময় একজন হোমরা-চোমরা অফিসারের ইচ্ছেয় মহফিল বন্ধ হয়।" বলতে বলতে ও উঠে দাঁড়াল। ঝুঁকে ছুটন্ত রেল লাইনের দিকে তাকাল।

রেল লাইনের ওপর ছুটন্ত রেলের যে ঘটাং ঘটাং দুলকি শব্দ, সেই শব্দের সঙ্গে ওর কথাগুলিও যেন দুলতে লাগল, "মহফিল বন্ধ হয়...মহফিল বন্ধ হয়।"

আমি আমার মস্তিষ্ক থেকে এই দুলকি শব্দের অদ্ভুত চালকে সরিয়ে ফেলতে ফেলতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর কি হল ?"

ছুটন্ত রেল লাইন আর পোস্টগুলি থেকে সে তার দৃষ্টি সরিয়ে বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "ওরা ওদের ঝলমল দামী পোশাক এক টানে ছিঁড়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বলল, "...নে দেখ, কি দেখবি, দেখ...আমরা খেলার বোন।... আমরা সেই শহীদ খেলার বোন, যার সমস্ত দেহ তোরা গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিলি। কারণ সে তার দেশকে ভালোবাসত। তার দেহে ছিল মাতৃভূমির রক্ত।...আমরা ওর সুন্দরী বোন। তোরা তোদের লালসার উষ্ণ রক্ত দিয়ে আমাদের দেহের খুশবুকে তোরা ক্ষতবিক্ষত কর...কিন্তু এ কাজ করার আগে শুধু তোদের মুখের ওপর আমাদের থু থু ছিটোতে দে।"

এই কথা কটি বলে সে চুপ হয়ে গেল। যেন সে আর কোন কথাই বলবে না। সঙ্গে সঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর কি হল ?"

ওর চোখ জলে ভরে উঠল, "ওদের গুলি করে হত্যা করা হল।"

আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না। গাড়ি ধীরে ধীরে গতি কমাতে কমাতে স্টেশনে এসে থামল। ও কুলি ডেকে নিজের মালপত্র ওঠাল। ট্রেন থেকে নামার সময় আমি ওকে বললাম, "আপনার গল্পের শেষ অংশটি আপনার বানানো।"

ও চমকে আমার দিকে তাকাল। বলল, "আপনি কি করে বুঝলেন ?"

বললাম, "আপনার কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে এক অদ্ভুত এক অজানা বেদনার রেশ ছিল।"

আমার সফরের সঙ্গী তার গলার মধ্যে দলা-পাকানো একগাদা থুক গিলতে গিলতে বলল, "আজ্ঞে...হাঁ...ঐ হারাম..."গালি দিতে দিতে ও থেমে গেল। "ওরা ওদের শহীদ ভাই-এর নামের ওপর কলঙ্ক লেপন করেছে।"... বলতে বলতে ও প্লাটফরমে নামল।

শাহদৌলার ইঁদুর

সলিমার যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স একুশ। তারপর পাঁচ বৎসর কেটে গিয়েছে, কিন্তু তার কোন ছেলেপেলে হয়নি। তাই মা এবং শাশুড়ি চিন্তিত। মার একটু বেশীই চিন্তা ছিল, কারণ সলিমার স্বামী নজিব আর একটা বিয়ে করে না ফেলে। বেশ কয়েকজন ডাক্তারের পরামর্শও নেওয়া হয়, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না।

সলিমার নিজেও খুব চিন্তিত ছিল। বিয়ের পর খুব কম মেয়েই আছে যার সন্তানের ইচ্ছা হয় না। সে তার মার সঙ্গে এ নিয়ে কয়েকবার পরামর্শও করেছে। মার বুদ্ধি মতো চলেও কোন লাভ হয়নি।

একদিন তার এক বান্ধবী, যাকে বাজা বলা হত, সলিমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার কোলে একটা নাদুস-নুদুস ছেলে দেখে সলিমা খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। সলিমা তার সেই আশ্চর্য ভাব নিয়েই জিজ্ঞেস করল, "ফাতেমা, তোমার এই ছেলে কেমন করে হল ?"

বয়সে ফাতেমা তার থেকে পাঁচ বৎসরের বড় ছিল। সে মুচকি হেসে বলল, "এ হচ্ছে শাহদৌলা সাহেবের মেহেরবানি। একজন মহিলা আমাকে বলে, তুমি যদি সন্তান চাও তবে গুজরাটে গিয়ে শাহদৌলা সাহেবের মাজারে প্রার্থনা করে বল, "আমার প্রথম যে বাচ্চা হবে তা আপনার মাজারে উৎসর্গ করব।"

সলিমাকে সে আরও বলল যে শাহদৌলা সাহেবের মাজারে প্রার্থনা করার পর প্রথম যে বাচ্চা হবে তার মাথা খুব ছোট হয়। ফাতেমার এই কথা সলিমার ভালো লাগল না। কিন্তু সে নজিবকে বলল যে প্রথম বাচ্চা যদি শাহ-দৌলা সাহেবের ইঁদুরের গর্তে দিয়ে আসতে হয় তবে তা খুবই দুঃখজনক।

সে মনে মনে ভাবল, এমন কোন্ মা আছে যে নিজের বাচ্চার কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে আলাদা হয়ে থাকবে! তার মাথা ছোট হোক, নাক চ্যাপ্টা হোক, চোখ কানা হোক—মা তাকে কিছুতেই দুর্দশার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না। যাই-ই করতে হোক না কেন, সন্তান তার চাই-ই। তাই সে তার চেয়ে বয়সে বড় বান্ধবীর কথা স্বীকার করে নিল। কারণ যে গুজরাটে শাহদৌলার মাজার সেখানকার সে মেয়ে ছিল। সে তার

স্বামীকে বলল, "ফাতেমা বারবার বলছে গুজরাটে আমার সঙ্গে চল। তুমি যদি বল তবে ওর সঙ্গে যাই।" তার স্বামীর এতে কি আপত্তি থাকতে পারে! তাই সে বলল, "যাও, তবে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এস।"

সে ফাতেমার সঙ্গে গুজরাটে চলে গেল।

সে যেমন ভেবেছিল তা নয়। শাহদৌলার মাজার বহু মূল্যে পাথরে তৈরী ছিল না। বেশ খোলা-মেলা জায়গায় ছিল। সলিমার খুব ভালো লাগল। কিন্তু এক ভিড়ের মধ্যে সে শাহদৌলার ইঁদুর দেখতে পেল। তার নাক দিয়ে সিকনি পড়ছিল। বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই ছিল না। দেখে সলিমা শিউরে উঠল।

তার সামনেই একটি যুবতী দাঁড়িয়েছিল। যৌবন তার সারা শরীরে চলমল করছিল, কিন্তু সে এমন ভঙ্গী করছিল যে খুব গম্ভীর মানুষও না হেসে থাকতে পারবে না। তাকে দেখে সলিমা মুহূর্তের জন্যে হাসল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ জলে ভরে উঠল। ভাবতে লাগল, না জানি এ মেয়ের কি হবে? এখানকার মালিক একে কারো কাছে বিক্রি করে দেবে। আর সে তাকে বাঁদর সাজিয়ে নানান জায়গায় ঘোরাবে। এই হতভাগী তার রুটি-রুজির উপায় হবে।

মেয়েটির মাথা খুব ছোট ছিল। সে ভাবল মাথা ছোট হলে তো মানুষের ভাগ্য আর ছোট হয় না। পাগলদেরও তো মাথা আছে।

শাহদৌলার এই মেয়ে ইঁদুটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল। তার প্রতিটি অঙ্গ ছিল নিখুঁত। মনে হচ্ছিল তার চেতনা-শক্তি ইচ্ছে করেই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সে এমন ভাবে হাঁটা-চলা করছিল এবং হাসছিল যেন কলের একটা খেলনা। সলিমার মনে হচ্ছিল এই উদ্দেশ্যের জন্যেই তাকে এমন করা হয়েছে।

কিন্তু এসব অনুভব সত্বেও সে তার বান্ধবী ফাতেমার কথা মতো শাহদৌলা সাহেবের মাজারে প্রার্থনা করল, তার বাচ্চা হলে সে তাকে এখানে উৎসর্গ করবে।

ডাক্তারের চিকিৎসা সলিমা বন্ধ করল না। দু মাস পর বাচ্চা হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল। সে খুব খুশী হল। সময় মতো তার একটা ছেলেও হল। ছেলেটা দেখতে খুব সুন্দর ছিল। গর্ভবতী হওয়ার সময় চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। তাই ছেলেটির ডান গালে ছোট্ট একটা কালো দাগ ছিল, যে দাগটির জন্যে

ছেলেটিকে দেখতে খারাপ লাগত না।

ফাতেমা এসে বলল, "বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি শাহদৌলা সাহেবকে দিয়ে দেওয়া উচিত। সলিমা নিজেও তা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে টালবাহানা করতে লাগল। তার মন কিছুতেই মানছিল না কি ভাবে সে তার চোখের মনি এই ছেলেকে ছুঁড়ে দিয়ে আসে।

তার যুক্তি ছিল, শাহদৌলা সাহেবের কাছে যে সন্তান চায় তার সেই প্রথম সন্তানের মাথা ছোট হয়। কিন্তু তার ছেলের মাথা তো বেশ বড়সর। ফাতেমা তাকে বলল, "সব সময় যে তা হবে এমন কোন কথা নয়, তুমি মিছেমিছি বাহানা করছ। তোমার বাচ্চার ওপর শাহদৌলা সাহেবের হক আছে। এর ওপর তোমার কোন অধিকার নেই। তুমি যদি তোমার কথা না রাখ তবে তোমার ওপর এমন গজব হবে যে তুমি জীবনে তা ভুলতে পারবে না।"

দুঃখে ভরপুর হৃদয় নিয়ে সমিলা তার নাদুস-নুদুস ছেলেকে, যার ডান গালে একটা ছোট্ট তিল ছিল—গুজরাটে গিয়ে শাহদৌলা সাহেবের মাজারের সেবকদের হাতে তুলে দিতে হল।

সে খুব কাঁদল। দুঃখে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। এক বৎসর ধরে জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে টানা পোড়েন চলল। সে তার সন্তানের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। বিশেষ করে ডান গালের কালো তিলের কথা সলিমার বারবার মনে পড়ছিল, যে তিলের ওপর হামেশাই সে চুমু দিত। কারণ এ তিল তাকে আরও সুন্দর করে তুলেছিল।

এই সময়টুকুর মধ্যে সে এক মুহূর্তের জন্যেও তার সন্তানকে নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন করেনি। সে অদ্ভুত ধরণের সব স্বপ্ন দেখত। শাহদৌলা ইঁদুরের রূপ নিয়ে তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলত। তার শরীরের মাংসকে তীক্ষ্ম দাঁত দিয়ে কাটত। সে চীৎকার করে তার স্বামীকে বলত, "আমাকে বাঁচাও, ইঁদুর আমার মাংস কাটছে।"

কখনও কখনও বা তার উদ্বিগ্ন মস্তিষ্কে মনে হতে তার সন্তান ইঁদুরের গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। সে যেন তার লেজ টেনে ধরে আছে। কিন্তু গর্তের মধ্যে যে বড় বড় ইঁদুরগুলো আছে, তারা তার থুথনি কামড়িয়ে ধরেছে। আর তাই সে তাকে টেনে বাইরে বের করতে পারছে না।

কখনও কখনও বা সে সেই মেয়েটিকে মানস চোখে দেখতে পেত।

পরিপূর্ণ যৌবনে-ভরা সেই মেয়েটি—যাকে সে শাহদৌল্লার মাজারের কাছে দেখেছিল। সলিমা হাসতে শুরু করে দিত। কিন্তু একটু পরেই সে কাঁদতে লাগত। সে এমন কাঁদতে শুরু করত যে তার স্বামী নজিব বুঝতে পারত না কিভাবে সে তার কান্না থামাবে।

সলিমা বিছানার ওপর রান্না ঘরে বাথরুমে সোফার ওপর হৃদয়ে কানে সব জায়গাতেই ইঁদুর দেখতে লাগল। কখনও কখনও বা নিজেকেই তার ইঁদুর বলে মনে হত। তার নাক থেকে সিকনি ঝরছে। সে শাহদৌল্লার মাজারের বাসিন্দাদের মধ্যে তার ছোট্ট—খুব ছোট্ট দুর্বল মাথা নিয়ে এমন ভাব-ভঙ্গী করছে যে দেখে তারা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। তার অবস্থা খুব দুঃখ-জনক হয়ে উঠল।

সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই সে কালো কালো দাগ দেখতে লাগল। জ্বর একটু কমলে সলিমার শরীর কিছুটা সুস্থ হল। নজিব খানিকটা আশ্বস্ত হল। সে সলিমার অসুখের কারণ জানত। নজিব খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিল। প্রথম সন্তানকে উৎসর্গ করার জন্যে তার কোন দুঃখ ছিল না। যা কিছু ঘটেছিল তা সে মেনে নিয়েছিল। সে বিশ্বাস করত তার যে ছেলে হয়েছিল তা তার নয়, শাহদৌলা সাহেবের।

সলিমার জ্বর একেবারে কমে গেলে এবং মন ও মস্তিষ্কের ঝড় থেমে গেলে নজিব তাকে বলল, "সলিমা, নিজের বাচ্চার কথা ভুলে যাও, ও আমাদের দুঃখের ধন ছিল।"

সলিমা খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, "কিন্তু মন যে মানছে না। সারা জীবন ধরে নিজের মমতাকে ধিক্কার দিয়েই চলব, কারণ আমি আমার চোখের মনিকে মাজারের চাকরের হাতে তুলে দিয়ে এসেছি। এযে কত বড় পাপ! চাকর কখনও মা হতে পারে না।"

একদিন সে পালিয়ে সোজা গুজরাটে চলে গেল। এবং সাত-আট দিন সেখানে থাকল। সে তার বাচ্চার খোঁজ-খবর করল। কিন্তু খবর পেল না। নিরাশ হয়ে সে ফিরে এসে তার স্বামীকে বলল, "আমি আর ওর কথা কখনও ভাবব না।"

কিন্তু সে ওর কথা ভুলতে পারল না। মনে মনে ভাবত। তার বাচ্চার ডান গালের দাগ তার হৃদয়ের দাগ হয়ে রইল। এক বৎসর পর তার এক মেয়ে হল। তার চেহারা হুবহু তার প্রথম সন্তানের মতো ছিল। শুরু

ওর ডান গালে কোন তিল ছিল না। তার নাম সে মুজিবা রাখল, কারণ প্রথম সন্তানের নাম সে মুজিবা রাখবে ভেবেছিল। যখন তার মাস দুই বয়স তখন একদিন সলিমা সুর্মাদানী থেকে সুরমা নিয়ে তার ডান গালে একটা তিল এঁকে দিল। আর মুজিবের কথা ভেবে কাঁদতে লাগল। দু'গাল বেয়ে যখন গড়াতে লাগল তখন সে তা তার ওড়না দিয়ে মুছে হাসতে লাগল। সে তার দুঃখ ভুলে যাওয়ার জন্যে চেষ্টা করছিল।

এরপর সলিমার আরও দুটি ছেলে হয়। তার স্বামী খুব খুশী ছিল।

একবার তার এক বান্ধবীর বিয়ে উপলক্ষে সলিমাকে গুজরাটে যেতে হয়েছিল। এই সুযোগে সে আর একবার মুজিবের খোঁজ-খবর নিল। কিন্তু কোন খবর পেল না। সে ভাবল, হয়তো মারা গিয়ে থাকবে। তাই বৃহস্পতিবার সে খুব ধুমধাম করে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করল।

আশ-পাশের সমস্ত মহিলারা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, সে কার জন্যে এমন ঝঞ্ঝাট করছে। কেউ কেউ সলিমাকে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু সে কাউকে কোন জবাব দিল না।

সন্ধ্যার সময় সে তার দশ বৎসর বয়সের মেয়েকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল। সুরমা দিয়ে তার ডান গালে তিল দিয়ে সেই তিলের ওপর খুব চুমু খেতে লাগল।

মুজিবাকে সে তার হারিয়ে যাওয়া ছেলে মনে করত। এখন থেকে সে তার কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিল। তার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পর ওর মনের বোঝা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। সে তার হৃদয়ের দুনিয়াতে তার কবরও রচনা করে নিয়েছিল। আর সেই কবরের ওপর সে তার ভাবনার ফুল ছড়িয়ে দিতে লাগল।

তার তিন ছেলে-মেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করত। প্রতিদিন ভোরে সলিমা তাদের তৈরী করে দিত। তাদের জন্যে জলখাবার বানাত। তাদের প্রত্যেককে এক এক করে দেখত। স্কুলে চলে যাওয়ার পর মুহূর্তের জন্যে তার মুজিবের কথা মনে পড়ত। যদিও সে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেছিল—তার হৃদয়ের বোঝা হাল্কা হয়ে গিয়েছিল, তবুও মাঝে মাঝে তার মনে হত মুজিবের ডান গালের কালো তিল তার মন জুড়ে বসে আছে।

একদিন তার তিন ছেলে-মেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে তাকে বলল, "আম্মা, আমরা তামাশা দেখব।"

সে খুব স্নেহের সঙ্গে বলল, "কি তামাশা ?"

সবচেয়ে বড় মেয়ে বলল, "আম্মা, একটা লোক কি সুন্দর তামাশা দেখাচ্ছে।"

সলিমা বলল, "যাও ওকে ডেকে আন। ঘরের মধ্যে যেন না আসে, বাইরেই যেন তামাশা দেখায়।"

বাচ্চারা দৌড়ে সেই লোকটাকে ডেকে এনে তামাশা দেখতে লাগল। খেলা শেষ হয়ে গেলে মুজিবা তার মার কাছে গেল পয়সা আনতে। মা পার্স খুলে চার আনা বের করে করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সদর দরজার কাছে গিয়ে সে দেখল শাহদৌলার ইঁদুর এক বিচিত্র মুদ্রায় নিজের মাথা দুলিয়ে চলেছে। সলিমার হাসি পেয়ে গেল।

দশ-বারোটি বাচ্চা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তারা এমন হট্টগোল করছিল যে কোন কথাই শোনা যাচ্ছিল না। সলিমা চার আনা হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। শাহদৌলার সেই ইঁদুরের হাতে পয়সা দিতে গিয়ে এক ঝটকায় সে পিছনে সরে এল, যেন বিদ্যুতের তারে সে হাত দিয়েছে। সেই ইঁদুরের ডান গালে একটা কালো তিল ছিল। সলিমা খুব ভালো-ভাবে তাকে দেখল। তার নাক দিয়ে সিকনি ঝরছিল। মুজিবা তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে তার মাকে বলল, "আম্মা,—এই—এই ইঁদুরের মুখের সঙ্গে আমার মুখের কি মিল, তাই না ? আমি কি ইঁদুর ?"

সলিমা শাহদৌলার সেই, ইঁদুরের হাত চেপে ধরে বাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে তাকে চুমু দিল—তাকে আদর করল। সে ছিল তার মুজিব। কিন্তু সে এমন ভঙ্গী করছিল যে সলিমার দুঃখের হৃদয়েও হাসি এসে থেমে যাচ্ছিল।

সে মুজিবকে বলল, "খোকা, আমি তোমার মা।"

শাহদৌলার ইঁদুর খুব জোরে হেসে উঠল। নাকের সিকনি জামার আস্তিন দিয়ে মুছে তার মার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "একটা পয়সা।" মা পার্স খুলল, কিন্তু তার দু'চোখ আগেই জলে ভরে গিয়েছিল। সে একশ' টাকার নোট বের করে বাইরে গিয়ে যে তার ছেলেকে নিয়ে তামাশা দেখাচ্ছিল সেই লোকটাকে দিল। সে এত কম টাকা নিয়ে তার রুটি-রুজিকে বিক্রী করতে অস্বীকার করল। অবশেষে সলিমা তাকে পাঁচশ' টাকায় রাজী করাল। টাকা দিয়ে সে ভিতরে এসে দেখল মুজিব সেখানে নেই। মুজিবা তাকে বলল সে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

সলিমার অন্তর চীৎকার করে বলতে লাগল, মুজিব ফিরে এস। কিন্তু সে এমন ভাবে হারিয়ে গেল যে আর কখনও ফিরে এল না।

আমি কেন লিখি? এ যেন এমন এক প্রশ্ন, কেন আমি খাই—কেন তেষ্টা মেটাই। যদি এই দৃষ্টিকোন থেকে এ প্রশ্নের বিচার করা যায়, তবে খাওয়া-দাওয়া এবং তেষ্টা মেটানোর জন্যে অবশ্য পয়সা খরচ করতে হয়। যখন আমি গভীর থেকে গভীরতায় প্রবেশ করি তখন বুঝতে পারি, আমি ভুল, কারণ টাকার জন্যেই আমাকে লিখতে হয়।

খাদ্যবস্তুই যদি সংগ্রহ করতে না পারি তবে আমার দৈহিক অবস্থা এমন থাকবে না,—কলমও ধরতে অক্ষম হব। হয়তো বা উপোস দিয়ে মগজকে চাঙ্গা রাখা যেতে পারে, কিন্তু হাতকেও তো সচল রাখা দরকার। হাত যদি না চলে, তবে অন্ততঃ মুখের বাতই চালু থাক! এ এমন এক ট্রাজেডি যে, মানুষ ভুখা পেটে কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না।

মানুষ শিল্প-কলাকে অনেক উর্ধে স্থান দিয়েছে। এর যে ঝাণ্ডা তা স্বর্গে গিয়ে ঠেকেছে। কিন্তু এ কথা কি অবিসম্বাদীভাবে সত্য নয় যে, প্রতিটি শ্রেষ্ঠ এবং মহান জিনিসই এক টুকরো শুকনো রুটির জন্যে উদগ্রীব?

আমি লিখি, তার কারণ আমি কিছু বলতে চাই। আমি লিখি এই জন্যে যে, লিখে আমি কিছু রোজগার করি এবং রোজগার করি বলেই অনেক কিছু বলতে পারি।

রুটি এবং শিল্প-কলার যে সম্পর্ক তা আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভুত বলে মনে হয়। কিন্তু কি করা যাবে, খোদাতাল্লা যে এই দুয়ের সম্পর্ক এভাবেই মঞ্জুর করেছেন। তিনি স্বয়ং নিজেকে সমস্ত বস্তু নিরপেক্ষ বলেছেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা। এই নিরপেক্ষতা এবং নির্লিপ্ততা ঠিক নয়। এর জন্যে এবাদত বা প্রার্থনা প্রয়োজন। আর এই এবাদত যেন খুবই কোমল এবং স্পর্শকাতর রুটির মতো। বরং বলা যেতে পারে, এ যেন ঘি-চুবানো রুটি, আর যে রুটি দিয়ে তিনি নিজের উদর পূর্তি করেন।

আমার প্রতিবেশী কোন মহিলা যদি প্রতিদিন তার স্বামীর হাতে প্রহৃত হয়, এবং প্রহৃত হওয়ার পরমুহূর্তে যদি তার জুতা সাফ করতে বসে, তবে তার জন্যে আমার হৃদয়ে কী অনুকম্পা বা দরদ থাকতে পারে? কিন্তু আজ-

কাল আমার প্রতিবেশী অনেক মহিলাই তার স্বামীর সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া এবং আত্মহত্যার হুমকি দেখিয়ে সিনেমা দেখতে যায়। আর ঘণ্টা দুয়েক ধরে যখন তাদের স্বামীদের আমি ব্যতিব্যস্ত বা হয়রান অবস্থায় দেখি, তখন তাদের দুজনেরই জন্যে আমার মধ্যে এক অদ্ভুত ধরণের বেদনা সৃষ্টি হয়। যদি কোন ছোকরা-ছুকরির মহব্বত হয়, আমি সর্দি হয়েছে বলে তা কখনও মনে করি না। কিন্তু ঐ ছোকরা আমার সমস্ত মন-প্রাণ তার দিকে আকৃষ্ট করে, যেন তার জন্য হাজার হাজার মেয়ে জান দিতে প্রস্তুত। আসলে সে ভালোবাসার এতই কাঙাল যেন বাঙলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ। এই প্রেমিক তার ভালোবাসার রঙীন কথার ফুলঝুরির মধ্যে যে করুণ গুমরে গুমরে ওঠা কান্নাকে ধরে রাখে, তা আমি আমার হৃদয়ের কান দিয়ে শুনব এবং অন্যকেও শোনাব।

চাকি-পেষাই কারী যে মহিলারা দিন-রাত পরিশ্রম করে এবং রাত্রে নিশ্চিন্ত ঘুমোয়, তারা আমার কাহিনীর হিরোইন হতে পারে না। আমার হিরোইন হচ্ছে বেশ্যা পট্টীর দুঃখী বেশ্যা, যে সারারাত জেগে কাটায় আর দিনে ঘুমোয়। আর ঘুমতে ঘুমতে কখনও কখনও বা ভয়ার্ত স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে, যেন সে বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছে, আর বুড়ো বয়সের দিনগুলি যেন তার ঘরের দরজায় সমানে টোকা মারছে। তার ভারি ভারি চোখের পাতার ওপর বহু—বহু বছরের ঘুম জমাট বেঁধে আছে। আর এইসব আমার আফ সানা—আমার কাহিনীর বিষয়বস্তু। ওর ক্লিষ্টতা ওর অসুস্থতা ওর খিটখিটে মেজাজ ওর গালি গালাজ—এসব কিছু আমাকে মুগ্ধ করে। আর তাই আমি ওদের জন্যে লিখি।…ঘরোয়া মেয়েদের যে আলসেমি, তাদের সুস্বাস্থ্য তাদের ন্যাকামি আমার পছন্দ হয় না।

সাদাত হোসেন মণ্টো লেখে। সে লেখে কারণ সে খোদার মতো মস্তবড় কাহিনীকার বা কবি নয় বলে। তার ভালোবাসা—তার মমতা তাকে লেখার জন্যে প্রেরণা জোগায়।

আমি জানি, আমার খুব খ্যাতি আছে। উর্দু সাহিত্যে আমার ভীষণ নাম। যদি জীবনে এই আনন্দ এবং উৎফুল্লতা না থাকত, তবে জীবন আরও অসাড় হয়ে যেত। আমার দেশ—পাকিস্তান, যেখানে আমি থাকি, সেখানে আমার কোথায় দাঁড়াবার স্থান, তা আজও আমি গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। সেজন্যে আমার রক্ত সব সময় চঞ্চল। তাই

আমি কখন পাগলা গারদে কখনও বা হাসপাতালে দিন কাটাই।

আমাকে হামেশাই জিজ্ঞেস করা হয়, আমি কেন মদ ছাড়তে পারছি না? আমি আমার জীবনের তিন চতুর্থাংশ খারাপ সংসর্গে উৎসর্গ করে দিয়েছি। এখন আমার এমন এক অবস্থা 'খারাপ সংসর্গ থেকে দূরে থাকা' শব্দটি আমার ডিকশেনারি থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছে।

আমার বিশ্বাস, খারাপ সংসর্গ বাঁচিয়ে আমি যদি এখন দিন গুজরাই তবে আমার জীবন হয়ে উঠবে কয়েদখানার বন্দীর মতো। আর যদি খারাপ সংসর্গ কেটে যায়, তবে তাও আমার কাছে জেলখানার অতিরিক্ত কিছু নয়। তাই কোন না কোন ভাবে যদি আমি মোজার সুতোর একটা দিক টানতে টানতে বেঁচে যাই, তবে তা আমার পক্ষে মঙ্গলকর।